বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প

বা

পঞ্চতন্ত্র (উত্তর ভাগ)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়-প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী,
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৮

প্রিণ্টার :—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা ।

ভূমিকা

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও মূল ভাষা। এই ভাষায় কবির ও কাব্যের অভাব নাই। এই ভাষায় যত উৎকৃষ্ট নীতি সন্নিবদ্ধ আছে, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতে তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশের গ্রন্থ-সমূহের যাবতীয় নীতির পূর্ণ সম্মিলনও বোধ হয় এক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নীতিসমূহের সমকক্ষ হইবে না। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও লোক-শিক্ষার পক্ষে প্রচুর নীতি লাভ করা যায়। এক একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ যেন নীতির কল্পতরু।

সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে বিষ্ণুশর্ম্মার 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র' নীতিশিক্ষা দানের উৎকৃষ্ট পুস্তক। পড়িলে মনে হয়, পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট নীতি যেন তাহাতে পরিস্ফুট রহিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, নরনারীনীতি, অর্থনীতি যাহা চাহিবে, তাহাই বিষ্ণুশর্ম্মার পুস্তকে মিলিবে। তাহা আবার এমন গল্প-সমন্বয়ে গ্রথিত যে বালকবালিকার, কি যুবক-যুবতীর চিত্তাকর্ষক না হইয়া পারে না। মহারাজ অমরশক্তির পুত্রগণ পঞ্চতন্ত্রের গল্পে যে ছয় মাসে ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সৎগুরুর সাহায্য পাইলে মেধাবী শিষ্য যে অতি অল্প কালে জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল হইতে পারেন, ইহা অতি সত্য কথা। বাস্তবিক 'পঞ্চতন্ত্র' লোকের আবশ্যক নীতিশিক্ষার হীরকখনি।

সংস্কৃত সাহিত্যের কত কাব্য, কত খণ্ডকাব্যই ইউরোপে আদৃত হইয়াছে, কিন্তু 'পঞ্চতন্ত্রের' ন্যায় কোন গ্রন্থই ইউরোপে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। সুনীতির আদর সর্ব্বত্র; সুনীতির

আদর চিরকাল বলবৎ,—তাহা দেশভেদে মলিনীকৃত হয় না। ইউরোপ নীতির আদর করিতে জানে, তাই ইউরোপে বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চতন্ত্র' এত সমাদৃত হইয়াছে। বোধ হয় সংস্কৃতের আর কোন গ্রন্থই সেখানে এত উচ্চতা বা পূজা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার দৃষ্টান্ত খুঁজিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। বলিতে গর্ব্ব উপস্থিত হয়, আমাদের এই বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষাতে অনূদিত হইয়া বালকবালিকাদিগকে আজিও উচ্চ নীতি শিক্ষা দিতেছে। কত শতাব্দী ধরিয়া যে এই গল্পগুলি সেখানে প্রচলিত, তাহা নিঃসন্দেহে এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। অধিক কি, আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মা আমাদের দেশে কখন উদ্ভূত হইয়া এই চির-উজ্জ্বল নীতি-কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। 'প্রমাদের ফল অনুতাপ' এই বিষয়ের সত্যতা যে 'অহি-নকুল' গল্পে বর্ণিত আছে, তাহা আজিও ইংলণ্ডবাসীদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ও আদরণীয়। লোকে কথায় কথায় "অহি-নকুলের" গল্প করিয়া থাকে।

শুধু ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্স, জার্ম্মণী, রুষ, রোম, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশেও এই বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি সেই সেই দেশের ভাষায় অনূদিত হইয়া নীতিশিক্ষা দানের আদর্শ হইয়াছে। বলিতে দুঃখ হয়, আবার অহঙ্কার ও গর্ব্বে হৃদয় পরিপূর্ণ হয় যে, আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলিই অল্প বিস্তর একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ইউরোপের কেহ কেহ "নীতি উপদেষ্টা" বা "সুপ্রসিদ্ধ নীতিগল্প-রচয়িতা" বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে ঈশপের গল্প পৃথিবীর সর্ব্বত্র এবং আমাদের দেশের ছাত্রমহলে এত প্রচলিত, সেই ঈশপের গল্পগুলিও আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলির রূপান্তর বা ভাবান্তর ভিন্ন অন্য কিছু নহে। রুষিয়াতে "ক্রিলফের" গল্প বড় বিখ্যাত, বড় প্রচলিত,—তাহাও আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলির ছিন্ন আবরণ বই

অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না। রোমের "সেন্টিয়ানোর" গল্পও যে বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পের অপকৃষ্ট চর্ব্বিত চর্ব্বণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলিতে বড় দুঃখ হয়, ইউরোপের ঈশপ ও ক্রিলফের নাম পৃথিবীতে অমর হইল, আর যাঁহার গল্প অবয়বশূন্য করিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, তাঁহার নাম পৃথিবীর অনেকের পরিজ্ঞাত নয়, অধিক দুর্ভাগ্যের কথা কি, আমাদের দেশের অনেক লোকে বিষ্ণুশর্ম্মার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। বোধ হয় সংস্কৃত চর্চ্চা একটু শিথিল হইলেই তাঁহার নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মার নাম কি এত সহজে বিলুপ্ত হইতে দেওয়া উচিত? যাঁহারা দেশের মূলনীতি রক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ হয় সেই বিষ্ণু-শর্ম্মার নাম রক্ষা করিতে অন্ততঃ একবার চেষ্টা করিবেন। আমি চিরকাল বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পের পক্ষপাতী। তাই আজ আমি কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার গল্পগুলি সরল বঙ্গভাষায় লিখিতে প্রয়াসী হই। আর্থিক ও শারীরিক অসুবিধায় আমি এই কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি প্রথমেই তাঁহার পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি লিখিতে চেষ্টা পাই। কিন্তু তাঁহার প্রথম দুই তন্ত্রের গল্প ও হিতোপদেশের গল্প প্রায় অনুরূপ,—কেবল উপাখ্যানে নামের পার্থক্য মাত্র। এই জন্য আমি পঞ্চতন্ত্রের শেষ তিন তন্ত্রের গল্পগুলির মধ্যে যেগুলি বালকবালিকার উপযোগী, সেইগুলিই সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কেন যে বর্ত্তমানে প্রচলিত সরল বাঙ্গালা ভাষায় এইগুলি লিখিলাম, তাহার কৈফিয়ৎও আমার দেওয়া আবশ্যক।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতমূলক। কতকগুলি কঠোর, কঠিন, সমাসচ্ছটা-বিজড়িত কথায় গল্প লিখিলে বালকবালিকার চিত্তাকর্ষক হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিশেষ আমাদের বঙ্গভাষা এখন এত 'চলিত' শব্দে গঠিত হইয়াছে যে, তাহা ছাড়া আগেকার গুরু-গম্ভীর শব্দ-প্রকৃতিতে কোন কিছু লিখিলে তাহা যেন "সেকালের" মত বলিয়া বোধ হয়, শিশুগণের পক্ষে বুঝিতে দুঃসাধ্যই হইয়া উঠে। তাই আমি সাধারণ প্রচলিত ভাষায় গল্পগুলি সরল ভাবে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাহাতে গল্পগুলির কোন অংশ ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

বিষ্ণুশর্ম্মার কথা বলিতে আরও এক আধটুকু কথা বলিতে হয়। তাঁহার "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" কেবল যে ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এমন নহে। ইউরোপই আজ কাল আমাদের দেশের আদর্শ, তাই তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু ইউরোপ ছাড়া এসিয়া এবং আফ্রিকাখণ্ডেও ঐ সকল গল্পের প্রসিদ্ধি লাভ কম হয় নাই। বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি বহুপূর্ব্বে পারস্য, আরবী, চীন ও মিসরী ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল।

যখন নুসীরবান পারস্যের বাদশাহ ছিলেন, তিনি বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি শুনিতে পান। তিনি গল্পগুলি একটু বিকৃত অবস্থায় শ্রবণ করেন। তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তিনি তাঁহার গৃহ চিকিৎসক মহাপণ্ডিত বর্জুয়াকে এই গল্পগুলি অনুবাদ করিয়া লইয়া যাইতে হিন্দুস্থানে পাঠাইয়া দেন। পণ্ডিতবর সংস্কৃতে লিখিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক পারস্যে লইয়া যান। তিনি সেই পুস্তকগুলির মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিই প্রথমে পল্‌হবি ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহার পর আব্বাস বংশের দ্বিতীয় খলিফার আদেশে সেই গল্পগুলির সমস্তই আরব্য ভাষাতে অনূদিত হয়। গল্পগুলির উৎকৃষ্টতা জানিয়া তাহা আবার পারস্য ভাষাতে অনূদিত হইতে থাকে। ভারত-আক্রমণকারী পারস্যরাজ সবক্তগীন সেই গল্প-গুলিকে ওয়ালিফ্‌ ও সারু নামে দুই কবিদ্বারা কবিতাকারে প্রকাশ করেন। তাহাও বালকবালিকার উপযোগী হয় নাই বলিয়া আবুলমালা

নস্‌রুল্লা পারস্য ভাষায় ইহার আর এক অনুবাদ বাহির করিয়া দেন। তাহাই 'কলিল উদ্‌মন্‌হ' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার ভাষা একটু কঠিন বলিয়া অনেকের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে নাই। অবশেষে এই গল্পগুলি হোসেন্‌ ওয়ায়েজ কাসাভি "আনোয়ারী সোহেলী" নামে এক পুস্তক প্রচার করেন। তাহার ভাষা বড় সহজ ও বড় সুন্দর হইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাহা সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মহাত্মা আকবর যখন দীল্লির সম্রাট, তিনি নিজে পণ্ডিত না হইলেও বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি "আনোয়ারী সোহেলীতে" পাঠ করেন। তিনি মুগ্ধ হন। তিনি তাঁহার মন্ত্রী বড় ঐতিহাসিক আবুলফাজল্‌কে এই গল্পগুলিকে আরও সুমধুর ভাষায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তীক্ষ্ণদর্শী সুপণ্ডিত আবুলফাজল্‌ সম্রাটের অনুরোধে বা নিজরুচি চরিতার্থ-তায় সেই গল্পগুলির ভাষা আরও সুললিত করিয়া দেন। আজিও সেই "আনোয়ারী সোহেলী" গ্রন্থ মুসলমান যুবকেরা অতি আনন্দে ও মহা আগ্রহে পাঠ করেন। চীন ও মিশর দেশেও বিষ্ণুশর্ম্মার "কাককোকিল" সংবাদের গল্পগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবস্থায় শুনা যায়।

পঞ্চতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের আবশ্যকতা অনাবশ্যক। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না। আমি সেই পঞ্চ-তন্ত্রের শেষ তিন তন্ত্রের গল্পগুলি অতি সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা পাই-য়াছি। সংস্কৃতের অন্যান্য কবিদিগের গ্রন্থের ন্যায় এই পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির মধ্যেও অশ্লীলতা দোষ দৃষ্ট হয়। আমি সেইগুলি অতি সাবধানতার সহিত বর্জ্জন করিয়াছি। ইহাতে গল্পাংশের কোন ক্ষতি হয় নাই বা কোন অঙ্গ শ্রীহীন হয় নাই। ইহার অনেক গল্পে স্ত্রীলোকের উপরও সন্দিগ্ধ কটাক্ষ আছে। তাহাও আমি বর্জ্জন করিয়াছি। ইহাতেও বিষ্ণু-শর্ম্মার গল্পের শৃঙ্খলার গুরুত্ব বিনষ্ট হয় নাই।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পের অনেক শাখাগল্প পুস্তকবিশেষে দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন বইতেই পঞ্চতন্ত্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া গল্পগুলি সন্নিবিষ্ট নহে। আমি যথাসাধ্য গল্পগুলির শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পগুলি যে প্রকারে রচিত, তাহা লোকের বিশেষতঃ বালক-বালিকার চিত্তাকর্ষক করিতে বহু চিত্রের আবশ্যক। আমি সেই জন্য কতিপয় গল্পে সুন্দর ছবি প্রদান করিলাম। সবগুলি গল্পেই চিত্রের সমাবেশ করিতে পারিলে সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইত, কিন্তু সময় ও অর্থ বাহুল্য ভয়ে আমাকে অতি দুঃখের সহিত নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি এই পুস্তক বালক বালিকার উপযোগী বলিয়া গৃহীত হয়, পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রভূত চিত্রের সমাবেশে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প" নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত একটু বিদ্রূপ কটাক্ষে চাহিবেন। অনেকে হয়ত এই বইখানিকে "বাজে" গল্পের বই মনে করিয়া হাসিবেন। কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মার নাম উজ্জ্বল করিতে—আমাদের বালক-বালিকার নিকট তাঁহাকে পরিচিত ও স্মরণীয় করিতে, তাঁহার পুণ্যনামে এই পুস্তকখানি বাহির করিলাম। বাসনা রহিল, এই 'বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প' নামেই পঞ্চতন্ত্রের পূর্ব্ব 'দুই তন্ত্র' ও 'হিতোপদেশের' গল্পগুলি বাহির করিব। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিষ্ণুশর্ম্মার চিরউজ্জ্বল ও যশস্বী নাম সংলগ্ন হইল বলিয়া এই দীন গ্রন্থকার গৌরবান্বিত হইল। এখন বালক-বালিকার নিকট গল্পগুলি আদর পাইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। ইতি—

কলিকাতা।
১৯১২

গ্রন্থকার—

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প

বা

পঞ্চতন্ত্র (উত্তর ভাগ)।

সূচনা।

সে অনেক দিনের কথা, বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কথা, ভারতবর্ষে এক নগর ছিল—নাম মিহিলারোপ্য। নগরের শ্রী আর কি বলিব, যেন ইন্দ্রপুরী।

মিহিলারোপ্যের যে রাজা, তিনিও যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র। তাঁহার কি পরাক্রম, কি শৌর্য্যবীর্য্য! তাঁহার নাম -- 'অমরশক্তি'। নাম যেমন 'অমর,'—বিষয়-কার্য্যেও তিনি অমর। নিজে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, একজন প্রসিদ্ধ বীর, শিল্প-বিজ্ঞানে মহাপণ্ডিত। তাঁহার শাসনে প্রজারা মহাসুখে বাস করিত—যেন 'রাম রাজ্যে' তাহাদের বাস।

রাজা বড় ধার্ম্মিক। দানে কল্পতরু, কেহই যাচ্ঞা করিয়া বিমুখ হইত না। লোকের মুখে রাজার ভারি সুখ্যাতি। না

হইবেইবা কেন ? অত গুণ যাঁর, তাঁরত অত বড় নাম হইবেই। গুণের সেবক যে খ্যাতি!

কালে রাজার পুত্র জন্মিল। ক্রমে সংখ্যায় হইল তিনটি। রাজা বড় সুখী হইলেন। ধনে জনে রাজার কোন অভাব নাই, সুখী হইবেন না কেন ? রাজকুমারগণের শ্রী কি, যেন এক একটি কার্ত্তিক। বলিতে কি, রাজকুমারেরা সৌন্দর্যে অতুলনীয় হইলেন। রাজা পুত্রগণের নামকরণ করিলেন— জ্যেষ্ঠের নাম হইল 'বলশক্তি', মধ্যমের নাম হইল 'উগ্র-শক্তি', আর কনিষ্ঠের নাম হইল 'অনন্তশক্তি'।

রাজপুত্রেরা বড় হইতে লাগিলেন, বেশ দৌড়-ঝাঁপের উপযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের যত বয়স বাড়িতে লাগিল, খেলার পিপাসাটা ততই বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা খেলা-ধূলা ভিন্ন অন্য কিছু চান না। সারাদিন কেবল খেলা,— কেবল খেলা।

রাজকুমারেরা বেশ বড় হইলেন, কিন্তু ক্রমেই খেলায় এত মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, খেলা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু জানেন না। কথাটা রাজার কাণে গেল। শুধু লেখাপড়ার বিষয় নয়, আরো অনেক কথা রাজা শুনিলেন। তিনি শুনিলেন কুমারেরা তো লেখাপড়া করেনই না, ইহা ছাড়া শাস্ত্র মানেন না, আচার মানেন না, নীতি মানেন না, সমাজ মানেন না, যাহা-ইচ্ছা-তাহাই তাঁহারা করেন।

রাজা বড় ভাবিত হইলেন। তাঁহার মনে সুখ নাই, খাওয়া-দাওয়ায় রুচি নাই, তিনি মহাচিন্তাকুল। পুত্রগণের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে রাজা অবসন্ন হইতে লাগিলেন।

পুত্র মূর্খ হইলে পিতার বড় কষ্ট। মূর্খ পুত্র যম-স্বরূপ, রাজা ইহা ভাবিয়া পাগলের মত হইলেন। মনে মনে অনেক উপায় স্থির করিলেন; কিন্তু উচিত যে কোন্‌টা, ঠিক করিতে পারিলেন না।

উপায়তো করিতেই হইবে? অগত্যা রাজা পরামর্শের জন্য মন্ত্রীদিগকে লইয়া একটি সভা করিলেন। সভায় সকলেই উপস্থিত হইলেন। রাজা কহিলেন,—

"মন্ত্রিগণ, আমি তো ভারি বিপদেই পড়িয়াছি। তোমরা মনে করিওনা, রাজ্যের কোন বিপদ। আমার বিপদ অন্য রকমের—কুমারদিগকে লইয়া। তাহারা সকলেই এক একটি মূর্খ হইয়াছে। লেখাপড়ায় তাহাদের মন নাই, কেবল খেলা লইয়া ব্যস্ত। তাহারা শাস্ত্র মানে না, লঘু গুরু মানে না, আচার মানে না—দিন দিনই দুরাচার হইতেছে। পণ্ডিতেরা সত্যই বলিয়াছেন, "মূর্খ পুত্র—চিরকাল দগ্ধ করিয়া মারে।"

মন্ত্রিগণ রাজার কথা শুনিলেন। রাজকুমারগণের অবস্থা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু মন্ত্রিগণ নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে এক উপায় স্থির হইল। তখন মন্ত্রিগণ রাজাকে কহিলেন,—

"মহারাজ, আপনি অত উতলা হইবেন না। কুমারেরা এখনও শিশু, এখনও তাঁহাদের শিক্ষার সময় বহিয়া যায় নাই। কুমারেরা কেহই বোকা নহেন, একটু সামান্য যত্ন করিলে, আর ভাল একজন শিক্ষকের হাতে পড়িলে, তাঁদের এই দোষ শোধরাইয়া যাইবে। আমরা এক উপায় বলিতেছি।"

রাজা শুনিয়া খুব খুসী হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বল, উপায়টা কি? আমার টাকা পয়সা যাউক, বিস্তর ক্ষতি হউক, আমি কিছুই ভাবিব না, কিন্তু এর একটা উপায় চাই-ই।"

একজন মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, বিদ্যা লাভ করানো বড় সোজা কথা নয়,—সময় আবশ্যক।"

মন্ত্রীরা কহিলেন,—

"মহারাজ, উপায় বড় বেশী শক্ত নয়, অতি সামান্য: আমাদের এই নগরে এক পণ্ডিত আছেন, তাঁর নাম বিষ্ণুশর্ম্মা। এমন শাস্ত্র নাই, তিনি জানেন না! এমন বিষয় নাই, তিনি বোঝেন না। নীতি শাস্ত্রে তিনিতো অদ্বিতীয়। আপনি কুমার-দিগকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিন। তিনি সুশিক্ষকও বটেন, তাঁহার হাতে পড়িলে কুমারগণ দেখিতে দেখিতে নীতিবান্ ও চরিত্রবান্ হইতে পারিবেন।"

রাজা মন্ত্রিগণের পরামর্শটা ভাল বোধ করিলেন। তিনি তখনই পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মার জন্য লোক পাঠাইলেন। পণ্ডিতবর সেই লোকের সহিত রাজবাড়ীতে আসিলেন। রাজা করযোড়ে

নিবেদন করিলেন, "পণ্ডিতবর, একটা বিশেষ কাজে আপনাকে আহ্বান করিয়াছি।"

রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তো মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া মহারাজকে কহিলেন, "মহারাজ, বিশেষ কাজ কি, আদেশ করুন, সাধ্য হইলে তাহা করিয়া দি।"

রাজা তখন কহিলেন, "পণ্ডিতবর, আমার তিনটি ছেলে, তিনটিই একরকমের। তারা না লেখে, না পড়ে, না শাস্ত্র মানে, না আচার মানে, কেবল খেলাধূলা লইয়াই ব্যস্ত। ক্রমে তাহাদের বয়স বাড়িতেছে, আমি তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অস্থির। ভাল একজন শিক্ষকের হাতে পড়িলে এখনও ভরসা আছে। আমি কুমারদিগকে আপনার হাতেই সঁপিয়া দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, আপনি যত্ন করিলে তাহাদের মতিগতি ফিরিতে পারে। সকলেই বলিতেছেন, আপনি উপযুক্ত গুরু, আপনি দয়া করিয়া এই ভারটা লইয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আপনাকে একশত গ্রাম দান করিব, অঙ্গীকার করিতেছি।"

বিষ্ণুশর্ম্মা হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই জন্য আপনি বিনয় দেখাইতেছেন? আমি কুমারগণের শিক্ষার ভার লইব। একটি কথা। শতগ্রাম কেন, সহস্র গ্রাম দিলেও আমি বিদ্যা বিক্রয় করিব না। আমি এম্‌নিই কুমারদিগকে শিক্ষা দিব।

অহঙ্কার মনে করিবেন না, আমি ঠিক বলিতেছি, আমি ছয় মাসে কুমারদিগকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত করিব।”

মহারাজ খুব খুসী হইলেন। কুমারগণের ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরু জুটিল। বিষ্ণুশর্ম্মা কুমারদিগকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। শুভদিন দেখিয়া গুরু শিষ্যদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

বালকেরা গল্প-প্রিয়,—গল্প শুনিতে বড় ভালবাসে। তাই পণ্ডিতবর নানা নীতির গল্প কহিবেন, ঠিক করিলেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা কুমারদিগকে প্রত্যহ নানা গল্প শুনান। গল্প-গুলিতে বড় সুন্দর নীতি,—বিষ্ণুশর্ম্মার দক্ষতায় সেই নীতিগুলিও কুমারেরা ক্রমে শিখিলেন। লোকের ধারণা, যে পাঁচটি প্রধান গল্প শুনিয়া রাজকুমারেরা নীতিজ্ঞ হইলেন, তাহাই জগতে ‘পঞ্চতন্ত্র’ নামে খ্যাত। সেই প্রধান পাঁচটি গল্প এই—“মিত্রভেদ, মিত্র-প্রাপ্তি, কাক-পেঁচক সংবাদ, প্রাপ্তধন নাশ এবং অপরীক্ষিতকরণ (দুঃসাহসিকতা)”। কথিত আছে,—কুমারেরা ছয়মাসে পণ্ডিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা একে একে দুইটি প্রধান গল্প আরম্ভ করিয়া সেই সঙ্গে বহু নীতি-গল্প বলিলেন। সেই গল্প দুইটি ‘মিত্রভেদ’ ও ‘মিত্রপ্রাপ্তি’। শুনিয়া কুমারেরা ভারি খুসী। গুরু কহিলেন, “কুমারগণ, এবার তোমাদিগকে আরও একটী অতি সুন্দর গল্প বলিব। ভারি আশ্চর্য্য গল্প,—শুনিলে আর কখনো ভুলিতে পারিবে না।”

* * * *

প্রথম অধ্যায়।

প্রধান গল্প—কাক-পেচক সংবাদ।

বিষ্ণুশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারগণ, যাহার সহিত শত্রুতা হইয়াছে, তাহার সহিত কি ভাবে চলা উচিত ?"

কুমারেরা সরল, উত্তর করিলেন, 'কেন, শত্রু যদি আবার মিত্রতা করে, তবে তাহাকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিব। এতো অতি সোজা কথা'।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, "কথাটাতো সোজা বলিলে, বাস্তব তাহা নয়। শত্রু যদি মিত্রতা করিতে আসে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। মনে রাখিও, শত্রুর শত্রুতা চিরকাল। বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ ঘটে। তোমরা সরল কিনা, বলিয়া ফেলিলে, ও-তো সোজা কথা। সর্ব্বনাশ যে ঘটে, তাহার এক

গল্প কহিতেছি, মনোযোগ দিয়া শোন, তবেই বুঝিতে পারিবে।”

কুমারেরা আগ্রহ দেখাইলেন,বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতে লাগিলেনঃ—
“এক নগর আছে, তার নাম মিহিলারোপ্য। নগরটি বেশ বড় —নানা বন, উপবন, পাহাড় পর্ব্বত তাহাতে আছে। সেখানে একটা বটগাছ ছিল। গাছটি বেশ বড়সড়, মোটাসোটা—একটু নিভৃত স্থানেও বটে। সেই বটগাছটাতে এক কাক বাস করিত,—তার নাম মেঘবর্ণ। সে নাকি কাকজাতির রাজা। সেই রাজা সেখানে দুর্গ তৈয়ার করিল। সৈন্য সামন্ত তার সেখানে মেলাই। সেই দুর্গে সে পরিবার লইয়া থাকে। তার ভারি সুখ।

সেই বটগাছের কিছুদূরে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়টিও সুন্দর—নেহাত ছোটোখাটো নয়। সেই পাহাড়ের গুহায় থাকিত একটা পেঁচা। তার নাম ‘অরিদমন’। সেও নাকি যত পেঁচার রাজা। তারও ভারি ঠাট্। তারও সৈন্য সামন্তের অন্ত নাই, ভারি জাঁকজমক।—পেচক নিশাচর, রাত্রি হইলেই তাহারা গুহার বাহির হইয়া উড়িয়া বেড়াইত। উড়িতে উড়িতে তারা সেই বটগাছের কাছে আসিত, আর কাক দেখিলেই ঠোক্‌রাইয়া মারিয়া ফেলিত। কাক রাত্রিতেতো চোখে দেখে না,—সুতরাং কি করে, নিরুপায়,—ক্রমে তাদের বংশ নষ্ট হইতে লাগিল।

পেঁচাগুলির ভারি অত্যাচার। তাদের অত্যাচারে সেই বটগাছের কাকগুলি উজাড় হইতে লাগিল। রোজ রোজই তাদের সংখ্যা কমিতে লাগিল। কাকের রাজা মেঘবর্ণের ভয়ের আর সীমা নাই, তিনিতো একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবারে নিরুপায়, নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না, তিনি মন্ত্রীদিগকে ডাকাইলেন। এক সভা বসিল। রাজার মুখ কালো, দুঃখে কথা বাহির হয় না। অতি কষ্টে দুঃখ কিছু চাপিয়া রাখিয়া রাজা কহিলেন,—

"মন্ত্রিগণ, আমাদের তো ভারি বিপদ, আমাদের যে মহা-শত্রু উপস্থিত। সেই শত্রুর যে রকম অত্যাচার, তাহাতে আর আমাদের নিস্তার নাই, বোধ হয় কয়েক দিনের মধ্যে আমরা সকলে মারা পড়িব। দেখ, আমরা সংখ্যায় কত ছিলাম, এখন বা কত আছি! আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের মৃত্যুতে আর এ প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহারা এখনও আছে, তাহাদের রক্ষা চাহিলে এইবেলা উপায় কর। দেখ, আমাদের কি বিপদ। আমরা দিনের বেলায় চোখে দেখি না, তাহারা কোথায় যাইয়া যে দিনে বাস করে, আমরা কিছুই জানি না। তাহারা কোথায় থাকে, তা যদি জানিতে পারিতাম, তবে তাহাদের বাসা পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া আসিতে পারিতাম। আমরা তো তাদের বাসাই জানি না,—তবে করিব কি? আমি তো উপায় ভাবিয়া আর পাই না। তোমাদিগকে ডাকিয়াছি, যদি

তোমরা কোন উপায় করিতে পার। তোমরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। আমাদের এই অবস্থায় যাহা উচিত পরামর্শ হয়, কর। উপায়ের মধ্যেতো দেখি ছয়টা। প্রথম 'সন্ধি' বা শত্রুর সহিত মিত্রতা করা; দ্বিতীয় 'বিগ্রহ' বা যুদ্ধ; তৃতীয়, 'যান' বা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাওয়া; চতুর্থ, 'আসন' বা যে স্থানে আছি, সেই স্থানেই বাস করা; পঞ্চম, 'সংশ্রয়' বা কোন ব্যক্তির আশ্রয় লওয়া; ষষ্ঠ, 'দ্বৈধীভাব' বা ছলে প্রলোভন দেখাইয়া শত্রুর সর্ব্বনাশ করা। এখন কোন্ উপায় লওয়া আবশ্যক, পরামর্শ দাও। বিপদ তো বুঝিতেছ, শীঘ্র কোন উপায় না করিলে সকলেই মারা যাইব যে।"

রাজার কথা শুনিয়া মন্ত্রীরা আর অধিক কি বলিবেন? তাঁহারা এইমাত্র কহিলেন,

"মহারাজ, বাস্তবিক আমাদের বড় দুঃসময়। আপনি আজ পরামর্শ চাহিয়া ভালই করিলেন। আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও এই সময়ে আমাদের সৎ পরামর্শ দেওয়া উচিত। উপায় একটা করিতেইতো হইবে, তা না হইলে সবংশে মারা পড়িব যে। এই জায়গাটা ভাল নয়, কোন এক নির্জ্জন জায়গায় যাইয়া পরামর্শ করিগে। যে বিপদ, কি জানি কেহ পাছে কিছু শুনিয়া যায়। চলুন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

মন্ত্রিগণের কথায় রাজা একটু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাল, চল এক নির্জ্জন স্থানেই যাওয়া যাক্, সেখানে

পরামর্শ হইবে।” রাজার সঙ্গে চলিলেন পাঁচ মন্ত্রী—উজ্জীবী, সঞ্জীবী, অনুজীবী, প্রজীবী, আর চিরজীবী। আর এক বৃদ্ধ মন্ত্রীকেও রাজা সঙ্গে লইলেন, তাঁর নাম স্থিরজীবী। তিনি রাজা মেঘবর্ণের পিতার আমলের মন্ত্রী,—ভারি বুদ্ধিমান, বড় চতুর।

নির্জ্জন স্থানে আসিয়া রাজা প্রথমে মন্ত্রী উজ্জীবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রী, এই বিপদে কোন্ পথ লওয়া উচিত ?”

উজ্জীবী দেরী না করিয়া উত্তর করিলেন,—“কেন, আমরা সন্ধি করিব। শত্রু যে বড় বলবান, সময় বুঝিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাহার সহিত সন্ধি না করিলে সকলে যে মারা যাইব। আমারতো মত সন্ধি। এখন আপনাদের আর সকলের মতে যাহা হয়, ঠিক করুন।”

ইহার পর রাজা সঞ্জীবীকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,

“আমার মতে সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করাই উচিত। শাস্ত্রে বলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিতে নাই। খল, লোভী, অধার্ম্মিক শত্রুর সহিত যুদ্ধই করিতে হয়, তাহাতে পুরুষত্ব প্রকাশ পায়। সন্ধি করে, যে কাপুরুষ। আপনি সন্ধি করিলে এই ফল হইবে, শত্রু আমাদিগকে আরও নির্জীব মনে করিবে, আর বার বার আক্রমণ করিতে সাহস পাইবে। আমার মতে, মহারাজ, সন্ধির প্রস্তাব ভুলিয়া যান, যুদ্ধ আবশ্যক হইয়াছে, আমরা যুদ্ধই করিব।”

সঞ্জীবীর মতটা রাজার মনে লাগিল। তিনি যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তবু অন্যতম মন্ত্রী অনুজীবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রী, এ বিষয়ে তোমার মত কি?”

অনুজীবী চিরকালের ভীরু, দাঙ্গা হাঙ্গামায় তিনি কখনো যান না। তিনি উত্তর করিলেন,—“মহারাজ, শত্রু তো চিরকাল শত্রু। তাহার সহিত সন্ধি করিতেও নাই, যুদ্ধ করিতেও নাই। আমার মতে শত্রুর সংস্রব ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাওয়াই উচিত। কাজ কি, মহারাজ, ঝগড়া ঝঞ্ঝাটে? চলুন এরাজ্য ছাড়িয়া চলিয়াই যাই, সকলে প্রাণে রক্ষা পাই।”

রাজা এক এক মন্ত্রীর কথা শোনেন, আর তাঁহার মতই ভাল —খুব ভাল—মনে করিয়া তাহাই মনে স্থির করেন। এবার আবার রাজা মন্ত্রী প্রজীবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রিবর, তোমার মতে আমাদের কোন্ উপায় অবলম্বন আবশ্যক? শুনিলেতো, তিন মন্ত্রীর তিন মত হইয়াছে।”

প্রজীবী ভীরু না হউন, তিনি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগের বিরোধী। তিনি কহিলেন, “মহারাজ, পরামর্শ তো কতই হইতে পারে। এইতো দেখি তিন মন্ত্রীর তিন মত হইল। সম্ভবতঃ আমারও অন্য মত হইবে। আমার মত যদি, মহারাজ, গ্রহণ করেন, তবে এই বলি, পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। চৌদ্দপুরুষের বাসস্থান ত্যাগ করা কি উচিত? ইহাতে ভাগ্যে যা হয়, হউক। অন্ততঃ এই সান্ত্বনাটাতো হইবে যে

বাপের ভিটায় মারা গিয়াছি ? মহারাজ, বিদেশে বিপাকে যাইয়া মরা কি ভাল ? চলুন, এখানেই থাকা যাক্, তার পর যা'থাকে কপালে।"

প্রজীবীর কথাটাও রাজার নেহাৎ মন্দ লাগিল না। তিনি ভাবিলেন, "বাড়ী, ঘর, রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় কোন্ অচেনা রাজ্যে যাইব ? প্রজীবী ঠিক কথাই বলিয়াছেন, মরিতে হয় পৈতৃক বাস্তুভিটাতেই মরিব,—বিশেষ দুঃখ থাকিবে না। আচ্ছা, চিরজীবীকেও তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা যাক।"

রাজা অবশিষ্ট মন্ত্রী চিরজীবীকে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। চিরজীবী চিরকাল পরের মুখাপেক্ষী। তিনি পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, আমরা দুর্ব্বল, শত্রু বলবান। লড়াই করিয়াতো পারিবনা-ই, সন্ধি করিতেও পারিব না—কারণ শত্রু সন্ধি করিবে কেন ? আর দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়া, তা'ও আমার মতে ভাল নয়। শত্রুরা কি আমাদের পিছু পিছু যাইয়া আমাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না ? এ-'ও ত মহাভুল। আমার মতে দেশে থাকাই উচিত, তবে নিজেদের রক্ষার জন্য চলুন—কোন বলবানের আশ্রয় লই বা সাহায্য চাই। ভাগ্যে যদি একজন বলবানের সহায়তা পাই, খুব ভালই। তবে আর শত্রুর কোন ভয় নাই। আর তাহা যদি একান্ত না পাই, তবে কোন দুর্ব্বলের আশ্রয় পাইলেইবা মন্দ কি ? আমরা তাহার সহিত মিলিলে শত্রু ভয় পাইবেই। আপনি তাহাই করুন,

কোন আশ্রয় লাভের চেষ্টা দেখুন। দেখিবেন, আমরা জয় লাভ করিতে পারিবই—দেশও ছাড়িতে হইবে না, সন্ধিও করিতে হইবে না, যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া মরিতেও হইবে না।"

রাজা যে মত শোনেন, সেই মতই তাঁহার ভাললাগে। তিনি চিরজীবীর কথাও অসঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু তবু যেন মনে প্রাণে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। রাজার পিতার মন্ত্রী বৃদ্ধ স্থিরজীবী সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহেন নাই, চুপ করিয়া বসিয়া রাজার মন্ত্রিগণের কথাই শুনিতেছিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পিতঃ, আমার মন্ত্রিগণের পরামর্শ ত শুনিলেন। এখন আপনার মতে, ইঁহাদের কাঁহার পরামর্শ ভাল বোধ হইতেছে? আমি আর অধিক বলিতে পারিব না, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

স্থিরজীবী অতি বৃদ্ধ, বড় বুদ্ধিমান। তিনি রাজাকে কহিলেন, "বৎস, তোমার মন্ত্রীরা সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই সুপরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহাদের কোনটিই এই সময়ে কাজে আসিবে না। সময় অনুসারে উপায় ধরিতে হয়। যে সময় বুঝিয়া উপায় না ধরে, তাহারই বিপদ। আমার মতে এখন ছলে শত্রুকে বশে আনিয়া বিনাশ করিবার সময়। ছল অবলম্বন না করিলে কেবল হারিবে, শেষে সকলের জীবন যাইবে। এই

উপায় অবলম্বন কর, বাড়ী ছাড়িতে হইবে না, পরের অনুগ্রহ চাহিতে হইবে না, যুদ্ধ করিতে হইবে না, সন্ধি করিতে হইবে না, কাপুরুষের মত পলাইতেও হইবে না। আমি যে উপায় বলিলাম, তাহাতে শত্রু প্রলোভনে পড়িবে, তখন তাহাকে যা-ইচ্ছা-তাই করিতে পারিবে, তোমার অভিলাষও পূর্ণ হইবে।"

মেঘবর্ণ উত্তর করিলেন, "পিতঃ, আপনি ত ছলের আশ্রয় লইতে বলিলেন। তাহা কি প্রকারে লইব ? আমাদের শত্রুরা কোথায় যে থাকে, তা'ত জানি না, প্রলোভন দেখাইব কাহাকে ? কি প্রকারেইবা সেই প্রলোভন দেখান যায় ?"

স্থিরজীবী হাসিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি এখনও ছেলে-মানুষ ; সংসার বোঝ না। তুমি চিন্তিত হইও না ; আমিই তাহার উপায় করিব। শত্রুরা কোথায় থাকে, তাহাদের কোথায় দুর্ব্বলতা, তাহা বোঝা শক্ত নয়। শাস্ত্রকারেরা কহেন, "রাজাদিগের চরই চক্ষু। সাধারণ লোক যেমন এই চামের চোখে দেখে, রাজারা তেমনি চরের চোখে দেখেন।" রাজাদের গুপ্তচর ভিন্ন উপায় নাই। তুমি ভয় করিও না, আমরাও গুপ্তচর নিযুক্ত করিব। শত্রুরা কোথায় থাকে, কি করে, কোথায় ঘা দিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, সকল খবরই তাহারা আনিয়া দিবে। দেখিও, চরের দ্বারা কত অল্প সময়ে আমরা শত্রু-নিঃশেষ করিতে পারি। তুমি কোন ভয় করিও না, আমি সব দিক রক্ষা করিব।"

রাজা মেঘবর্ণ ত ভারি খুসী। তিনি স্থিরজীবীর কথায় যেন হাতে আকাশ পাইলেন। এখন প্রকৃত উপায় স্থির হইল জানিয়া তিনি নিরাপদ বোধ করিলেন। ইহার পর নানা কথা চলিল। কথাপ্রসঙ্গে রাজা স্থিরজীবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, পেঁচার সহিত আমাদের এই চিরশত্রুতা হইল কেন ? আমি কিন্তু ইহার কিছুই জানি না।"

স্থিরজীবী কহিলেন, "জান না ? আচ্ছা, কারণটা আমি কহিতেছি। একবার পক্ষী জাতির এক সভা হয়। সে সভা খুব মস্ত সভা—অনেক হাঁস, সারস, টিয়া, কোকিল, চড়াই, পেঁচা উপস্থিত থাকে। সকল জাতির পাখীই লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে। সভার কারণটা শোন, তাহারা একজন নূতন রাজা করিবে। গরুড়—পক্ষীর রাজা, বাস্তবিক তিনি রাজা হইবার উপযুক্ত। তাঁহার মত বলশালী, ক্ষমতাশালী পাখী কে ? অন্যান্য পাখীরা কিন্তু বড় নারাজ, তাঁহাকে দেখিতে পারে না, তাই নূতন রাজা করিতে এই সভা। সভা হইলেই বক্তৃতা, এই সভায়ও কম বক্তৃতা হইল না,—কিন্তু সকলেই গরুড়ের বিরুদ্ধে। তাহারা বলিল, "গরুড়ের ভারি দোষ, তিনি ছোট ছোট পাখীদের কোন খোঁজখবরই লন না। কষ্ট পাউক, দুঃখ পাউক, গরুড়ের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। যে রাজা প্রজার দিকে না চান, তাঁহাকে রাজা রাখিবার দরকার ? গরুড়ের বড় দেমাক বাড়িয়াছে,—কৃষ্ণের বাহন কি না, তাই তাঁহার এত অহঙ্কার।

আচ্ছা, আমরা তাঁহাকে রাজা রাখিব না, রাজা করিব এই পেঁচাকে।”

সভাতে ভারি হুলস্থূল, পেঁচাকে রাজা করিতেই হইবে। সকলে উঠিয়া পড়িয়া পেঁচাকে রাজা করিবার উদ্যোগে লাগিয়া গেল। পেঁচার আজ যে মহা আনন্দ। সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল, আর সকলকে তাহাদের বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করিতে লাগিল। যত পাখী ছিল, সকলে অভিষেকের আয়োজনে ব্যস্ত রহিল। এ পাখী এইটা আনে, ও পাখী অইটা আনে, এইরূপে নানা দ্রব্য আসিল। দেখিতে দেখিতে বহু দ্রব্যে ভাণ্ডার পূর্ণ হইল। পাখীদেরও মহা আনন্দ—কত গান, কত নাচ, কত বা হৈহৈ রৈরৈ শব্দ। কত আমোদ প্রমোদ—এমন সময়ে একটা কাক 'কা কা' করিতে করিতে সেই উৎসবের স্থানে আসিয়া উপস্থিত। কাক অভিষেকের কিছু জানে না, সে ভাবিল—“একি ? এই উৎসব কেন ? এ যে দেখিতেছি অভিষেকের মত কাণ্ড! ব্যাপারখানা কি ? গরুড়-গোষ্ঠী কি মরিয়াছে ?” সে অবাক হইয়া দূরে নীরব রহিল, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একবার 'কা, কা' করিতে লাগিল।

সভায় পাখীর অন্ত নাই। তাহাদের কেবল কিচির-মিচির শব্দ। তাহারা কাককে দেখিয়া বলিল, “ভাই, এখানে এস, অত দূরে কেন ? আজ আমরা গরুড়কে তাড়াইয়া পেঁচাকে রাজা করিবার উদ্যোগ করিয়াছি। পেঁচা হইবে খুব ভাল রাজা।

সে আমাদের কত খাতিরযত্ন করিবে, আমাদের কত উপকার করিবে। কেমন, ভাই, উপকার হইবে না? শুনিতে পাই, কাক বড় চতুর জাতি। আচ্ছা, তুমিই বল না কেন, উপকার হইবে কি না—আমরা কাজটা ভাল করিয়াছি কি না? তোমার উপরই ভার রহিল,—তুমি, ভাই, যে পরামর্শ দিবে, আমরা সেই মতেই কাজ করিব।”

কাকটা তো চুপ,—একবারে চুপ, তাহার মুখে আর কথা নাই। সে ভারি অবাক, এমন কি একটু রাগিয়াও গিয়াছে। বাস্তবিক উপযুক্ত রাজাকে তুচ্ছ করিয়া একটা অপদার্থকে রাজা করিলে কাহার না রাগ হয়? কাক তো প্রথমে কোন কথাই কহিল না, অনেকক্ষণ পরে কহিল,—

“পেঁচাকে রাজা করিতেছ? তোমাদের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ! গরুড়কে বাদ দিয়া আর কি কোন পাখী পাইলে না যে পেঁচাকে রাজা করিলে? ছি, ছি, তোমাদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছে? কোথাকার একটা পেঁচা, তাকে কিনা রাজা করা? পাখীদের মধ্যে ময়ূর আছে, রাজহাঁস আছে, আরো কত কি সুন্দর পাখী আছে। তাহাদের কাহাকে রাজা করিলে না, করিলে কি না একটা পেঁচাকে? তার যেমনি গুণ, তেমনি রূপ। তোমাদের যেমনি বুদ্ধি, তেমনি তো করিবে? বাঃ, বেশ করিয়াছ, তোমরা তোমাদের রাজা লইয়া থাক, আমি চলিলাম। কি বোকা তোমরা, যে গরুড় জীবিত থাকিতে অন্যকে রাজা করিবে! গরুড়

—মহাশয় লোক, যেমন তাঁর বুদ্ধি, তেমন তাঁর প্রতাপ। তাঁহার শাসনে তোমরা কত সুখে আছ, বুঝিতে পার? তাঁহার ভয়ে কে তোমাদের নিকটে আসিতে সাহস পায়? কে তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে? ছাড়িয়া দাও সেই কথা। এক রাজা থাকিতে অন্য রাজা করিতে হয় কি? হউন না তিনি মহাগুণবান্, মহাবিদ্বান, মহাসাহসী বা মহাপরাক্রমশালী! ভাবিয়া দেখ, গরুড়ের মত রাজা পাইবে না। অমন সদাশয় গুণশালী রাজা কি আর হয়? গরুড় রাজার মত রাজা। মনে রাখিও মহাত্মাদের অশেষ গুণ। তাঁহাদের দর্শনে সুপ্রভাত, তাঁহাদের নাম করিলে কার্য্যসিদ্ধি। ইহা কি অলীক কথা? দেখ, শশকেরা শশধরের নাম করিয়া, কত সুখে কাল কাটাইয়া গিয়াছে!"

কাকের কথা শুনিয়া পক্ষীরা তো অবাক,—তাহাদের মুখে আর কথা নাই, লজ্জায় যেন তাহাদের মাথা কাটা যাইতে লাগিল।

পাখীরা বলিল,—"শশকেরা শশধরের নাম করিয়া সুখে কাল কাটাইল কিপ্রকারে, গল্পটা একবার বলুন। বাস্তবিক কি তারা সুখে কাল কাটাইয়াছিল?"

কাকের এখন সাহস আসিল। সে আগে মনে করিয়াছিল,—পাখীরা তাহার কথা উপহাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবে। কাক বলিল, "হাঁ, সত্য সত্যই তারা খুব সুখে কাল কাটাইয়াছিল, গল্পটি শোন, বলিতেছি।"—

শাখা গল্প ১।

‘চতুর্দ্দন্ত’ গজরাজ ও শশকের উপাখ্যান।

“এক দেশে ছিল একটা বন। সে ভারি মস্ত বন, তাহাতে নানা বড় বড় পশু দল বাঁধিয়া বাস করিত। সেখানে হাতীরও একটা দল ছিল। সে দলের যে রাজা, তাহার নাম ছিল ‘চতুর্দ্দন্ত’। তার ভারি পরাক্রম, তার প্রতাপে সেই বনে আর কোন পশু থাকিতে পারিল না। সে মহাসুখে তার দল লইয়া আমোদ-আহ্লাদে আহার-বিহার করিয়া কাল কাটায়।

সুখ কারও চিরদিন থাকে না তো, হাতীর রাজারও সুখের সময় কাটিয়া গেল। বনে আর বৃষ্টি নাই,—সকলের হাহা-কার। সে আবার এক আধ মাস নয়, বৎসরাবধি নয়,—ক্রমাগত কয়েক বৎসর। এক ফোটা বৃষ্টির নাম-গন্ধ নাই, পুকুর, দিঘী, হ্রদ সকলই শুকাইয়া গেল। জলের বড়ই অভাব,—জল না পাইলে জীবের প্রাণ বাঁচে কি? জল—খাইতে

লাগে, স্নান করিতে লাগে, আরও কত কি কাজে লাগে। সেই জল না পাইলে যে ভারি বিপদ। বনে যে সকল জন্তু ছিল, তাহাদের কষ্টের হইল একশেষ—অধিক কি, সকলের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইল।

হাতীর জল লাগে বিস্তর। তাহাদের ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল,—অনেকগুলি মরিয়া যাইতে লাগিল। ভারি বিপদ দেখিয়া তাহারা দলে দলে তাহাদের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ, আমাদের যে ভারি বিপদ। জলের অভাবে যে আমরা সকলে মারা যাই। আরতো জলের কষ্ট সহ্য হয় না! জল না পাইয়া অনেক হাতী মরিয়াছে, আরো অনেকে মরিতে বসিয়াছে। যদি আমাদিগকে বাঁচাইতে চান, নিজেও বাঁচিতে চান, তবে জলের একটা বন্দোবস্ত করুন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, এখনই চারিদিকে চর পাঠান, তাহারা কোন জলাশয়ের খোঁজ করুক। দেখুন, জল-পিপাসায় সকলের ছাতি কাটিয়া যাইতেছে।"

রাজা শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া চারিদিকে চর পাঠাইতে লাগিলেন। উন্মত্তের ন্যায় হই-বারই তো কথা, ভাল রাজা প্রজার কষ্ট শুনিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রজার হিত করিয়া আনন্দ দান করেন বলিয়াই তো রাজাকে 'রাজা' বলা যায়। রাজার হুকুম হইল,—

চরেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে যাইবে। রাজার হুকুম, লঙ্ঘন কি আর হয়? চরেরাতো চারিদিকে জলের অন্বেষণে ছুটিল। এক দল গিয়াছিল পূর্ব্বদিকে। কিছু দূর গেলেই তারা দেখিতে পাইল একটা প্রকাণ্ড হ্রদ—নাম 'চন্দ্র হ্রদ'। তাহার কি সুন্দর জল—যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, নির্ম্মল! হ্রদটি বেশ গভীর, তাহাতে বিস্তর জল। নানাবিধ পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার তাহাতে ফুটিয়া আছে। কি সুন্দর মনোহর শোভাই তাহাতে হইয়াছে! পূর্ব্বদিকের দলের চরদের আনন্দ আর দেখে কে! তাহারা তখনই এই শুভ সংবাদ রাজাকে দিতে ফিরিয়া চলিল। ছুটোছুটি করিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহারা রাজার কাছে পৌঁছিল। রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ভারি খুসী—তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? কোন জলাশয় দেখিতে পাইয়াছ কি?"

চরেরা নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমরা সুন্দর এক হ্রদ দেখিয়া আসিয়াছি। তাহা আর কি বলিব,—তাহার জল যেমন সুন্দর, তেমন গভীর; এমন হ্রদ আর দেখি নাই। সর্ব্বদা পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার তাহাতে ফুটিয়া আছে, আর কেমন নির্ম্মল, টলটলে জল! তাও যেন অফুরন্ত,—তাহাতে সর্ব্বদা গঙ্গার জল আসিতেছে—নূতন জলে হ্রদ কাণায় কাণায় ভরপুর। এক বৎসর কেন—এক শত বৎসর ব্যবহার করিলেও সেই হ্রদের জল ফুরাইবে না। মহারাজ, আর ভাবনা নাই, চলুন সকলে সেই হ্রদে চলিয়া যাই,

জলপানের আর স্নানের কোন অসুবিধা হইবে না। যে কষ্ট পাইয়াছি, মহারাজ, ভাগ্যগুণে বোধ হয় আর জল-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। এখান হইতে দূরও বেশী নহে, বন ছাড়াইলেই পূবের দিকে সেই হ্রদ।”

রাজা শুনিয়া তো আনন্দে আটখানা,—তিনি হাসিলেন, ভারি খুসী হইলেন। আর আর হাতীগুলিরও আনন্দ আর ধরে না, তাহারা যেন জলের আশায় আত্মহারা। সেই হ্রদে যাওয়াই ঠিক হইল। হাতীর রাজা চলিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতীগুলিও চলিল। তাহাদের কি চলনভঙ্গী,—কেহ পাশাপাশি ভাবে, কেহ কাহারও পথ আগুলিয়া, কেহ কাহারও পা শুঁড়ে বদ্ধ করিয়া, কেহ শুঁড় ঊর্দ্ধে তুলিয়া, কেহ শুঁড় গুটাইয়া, কেহ শুঁড়ের জল গায়ে ঢালিতে ঢালিতে, কেহ সাম্নে যে গাছ-ডাল-পালা পাইল, তাহা মাথায় করিয়া, কেহ বা খাইতে খাইতে চলিল। কিছুকাল হাঁটিলেই তাহারা সেই হ্রদের পাড়ে আসিয়া পৌঁছিল। বাস্তবিক সেই হ্রদের জল ভারি সুন্দর, হ্রদটিও বেশ বড়, হাতীগুলির খুব আনন্দ হইল। অনেক দিন জলের কষ্ট পাইয়াছে কি না—এমন সুন্দর জল দেখিয়া তখনই হাতী-গুলি জলে পড়িয়া পেট ভরিয়া জল পান করিল,—আর যত ইচ্ছা স্নান করিল। কত পদ্ম, কত মৃণাল হাতীগুলির শুঁড়ের ঘায়, পায়ের চেপ্‌টানিতে মারা গেল! সুন্দর হ্রদ হাতীগুলির লাফে ঝাঁপে ঘোলা হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত দিন এইভাবে

হাতীগুলি জলে রহিল। যেই সন্ধ্যা আসিল, অমনি তাহারা জল হইতে উঠিয়া বনের দিকে ফিরিয়া চলিল। রোজই হাতীগুলি এরূপ করিতে লাগিল—ভোরে আসে, আর ফিরিয়া যায় সন্ধ্যায়। হাতীগুলির আর তো কোন ভয় নাই যে জলের অভাবে মারা পড়িবে?—তাহারা যেখানে সেখানে খেলিয়া বেড়াইয়া খুব হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠিল।

হাতীগুলির খুব সুখ ও মজা হইল বটে, শশক বেচারারা কিন্তু মারা যাইতে লাগিল। সেই হ্রদের চারিপাশেই শশকদের বাস,—তাহাদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত। হাতীর যাতায়াতে, পায়ের ভরে, শশকগুলির গর্ত্ত চেপটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল,—শত শত শশক মারা পড়িতে লাগিল। হাতীর চলন যেখান দিয়া হয়, সেখানটাই যেন রসাতলে যায়—শশকগুলির কাহারও বা হাত, কাহারও বা পা ভাঙ্গিয়া, কোনটা বা চেপ্‌টিয়া মাটিতে বসিয়া গেল। শশক মহলেতো মহা হাহাকার পড়িয়া গেল,—কখন্ কাহার কি হয়-কি হয়।

হাতীরা রোজ আসে, রোজ যায়, আর শশকেরা প্রাণে মারা পড়ে। একদিন হাতীগুলিতো জলখেলা করিয়া চলিয়া গেল। তখন যেসকল শশক প্রাণে বাঁচিয়া ছিল, তাহারা মিলিয়া এক সভা করিল। সেই সভাটা আর কিছুর জন্য নয়, কেবল বাঁচিবার উপায় করিতে। সভা বসিলে একটা শশক বলিল, "বন্ধুগণ, আমরা তো প্রায়ই মরিলাম—বাকী অতি অল্প! যেরকম গতিক,

তাহাতে অধিক দিন বাঁচিবারও সম্ভাবনা দেখি না। হাতীগুলি জলের সন্ধান পাইয়াছে, তাহারা রোজ তারিখে এখানে আসিবে, চারিদিকে দৌড়ধাপ দিবে, আমাদের মৃত্যু তো নিশ্চিত। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন পথ হইতে পারে কি? এখনই কোন উপায় না করিলে সকলে নির্ম্মূল হইব যে। যদি বাঁচিতে চাও, এখনই একটা উপায় কর।"

সকল শশকেই কথাটা শুনিল। কিন্তু কে কি জবাব দিবে? সকলেরই ত ভয়—কখন্ কি হয়। কিন্তু একটা শশক প্রাণের ভয়ে বলিয়া উঠিল,—"থাক্, আর উপায়ের দরকার নাই, চল সকলে এই স্থান ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে পলাইয়া যাই। উপায় স্থির করিতে করিতে যে সকলে মারা যাইতেছি, তাহা কি দেখিতেছ না? এখনও সময় আছে, চল, চল, পলাইয়া যাই।"

তখন আর একটা শশক বলিয়া উঠিল, "না, বেশ কথা ত! এখানে চৌদ্দপুরুষের বাস, মুখের কথায়ই তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? ঘর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া বড় সোজা কথা কি না, মুখে বলিলেই হইল। আমার কিন্তু, ভাই, অন্যরকমের মত। আমার মতে হাতীগুলিকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করা, যেন তাহারা আর এই হ্রদে না আসে। যদি এতেই তারা নিরস্ত হয়, খুব ভাল কথা, আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাহা হইলে পৈতৃক বাড়ী ঘর ছাড়িতে হইবে না, কাহাকেও বিদেশে যাইতে হইবে না, আমরা এখানেই সুখে কাল কাটাইতে পারিব। কৌশলে শত্রু তাড়ানই

বুদ্ধির কাজ, তাহাতে নিজেদেরই ক্ষমতা প্রকাশ পায়। কাপুরুষের মত পলাইয়া যাইতে ত সকলেই পারে!”

এই প্রস্তাবটা খরগোসগুলির মন্দ লাগিল না। একটা শশক বলিয়া উঠিল, “বুঝিলাম, এ প্রস্তাবটি ভাল, কিন্তু তাহা করিবার উপায় কি? হাতীগুলি যে এক একটা পাহাড়, তাহাদিগকে আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের ভয় দেখান কি সোজা? —কেবল পরিহাসের কথা হইবে না কি?”

খরগোসগুলির মধ্যে মহা গুলতানি উঠিল। কে কার কথা শোনে? তখন একটা শশক কহিল, “যদি এই মতলবই হয়, তবে এর একটা উপায় আছে। আমাদের রাজা বিজয় দত্ত চন্দ্রমণ্ডলে থাকেন। তাঁহার কথা হাতীরা জানে। তাঁহাকে চন্দ্রের নাম করিয়া হাতীর রাজার কাছে দূত পাঠাও। তিনি যাইয়া বলিবেন, ‘চন্দ্র বলিয়া পাঠাইয়াছেন—এই চন্দ্র হ্রদের চারিদিকে আমার অনুচরেরা বাস করে। আমি শশকদের আশ্রয়দাতা, আর যেন হাতীরা জলখেলা করিতে এই হ্রদে না আসে। হাতীরা নাকি বড় অত্যাচারী, আমার অনুচরদিগের উপর ভারি উৎপাত করিতেছে। যদি ভবিষ্যতে কোন উৎপাতের কথা শুনিতে পাই, তবে হাতীগুলির রক্ষা নাই, হাতীর রাজাও মারা পড়িবে।’ দূতের মুখে হাতীর রাজা এই কথাটা শুনিতে পারিলে, তাহার প্রাণে ভয় হইতে পারে, বোধ হয় তাহা হইলে আর এই হ্রদে আসিবে না। চন্দ্রের যে কেমন প্রতাপ, তা’তো হাতীরা

জানে ? যদি একান্তই এই কথা না মানে, তাদের প্রাণে একটু ভয় হইবেই।”

আর একটা শশক তখন একটু সাহস পাইয়া কহিল, “হাঁ, কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়, হাতীরা ভয় পাইলেও পাইতে পারে। প্রাণের ভয় পাইলে হাতীরা না আসিতেও পারে। যদি দূত পাঠানই ঠিক হয়, তবে লম্বকর্ণকেই দূত করিয়া পাঠান উচিত। সে খুব কাজের লোক,—খুব চতুর, খুব তুখোড়। দূত অমন লোকেরই হওয়া উচিত।”

সভার আর আর শশকেরা তখন আনন্দে কহিল, “বা, বেশ পরামর্শই হইয়াছে। এই উপায় ছাড়া আর বাঁচিবার উপায় দেখি না। আমাদের সকলেরই প্রাণে এই পরামর্শটা ভাল লাগিয়াছে। এই পরামর্শের মতই কাজ হউক। আর দেরীর দরকার নাই, লম্বকর্ণকে এখনই দূত করিয়া পাঠান যাক্।”

লম্বকর্ণকে তখনই শিখাইয়া পড়াইয়া দূত করিয়া পাঠান হইল। সে সাহসী,—ভয় না করিয়া হাতীর রাজার কাছে চলিল। কতকদূর সে গিয়াছে, অমনি দেখিল হাতীরা হ্রদের দিকে আসিতেছে—প্রথমেই রাজা চতুর্দ্দন্ত। দেখিয়াই তো লম্বকর্ণের প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে ভাবিল,“দূত হইয়া তো আসিলাম, এখন কথাগুলি বলি কি করিয়া ? হাতীগুলি যে পাহাড় পর্ব্বতের মত, উহাদের কাছে গেলে আর রক্ষা নাই। বাপরে, উহাদের কাছে যাইতেই যে ভয় হইতেছে। সাধ করিয়া কে আর যমের

কাছে যায় ? যা'হ'ক যখন আসিয়াছি, কথাটা বলিবই।" নিকটে ছিল একটা উঁচু জায়গা। লম্বকর্ণ তাহাতে উঠিল।

হাতীরা শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া সেই উঁচু জায়গাটার নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। তখন লম্বকর্ণ 'মরি বাঁচি' করিয়া হাতীর রাজাকে কহিল, "ওরে দুষ্ট বর্ব্বর, তোর দেখ্‌ছি ভারি আস্পর্দ্ধা! তুই রোজ রোজ পরের হ্রদে যাইয়া জল খাস্, জল ঘোলা করিস, আর জল তোলপাড় করিস্ কেন ? তোর কি প্রাণে ভয় নাই ? জানিস্, ঐ হ্রদ কাহার ? তিনি একটু মনে করিলেই তোদের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। যদি ভাল চাস্, এখনও ফিরিয়া যা, তা না হইলে এখনই প্রাণে মরিবি।"

একটা খরগোস হাতীর রাজাকে এমন কথা কহিতে সাহস করিতেছে, ইহা দেখিয়া চতুর্দ্দন্ত তো অবাক,—একবারে স্তম্ভিত। প্রাণের ভয় দেখাইলে, হাজার বলশালীকেও ভীত হইতে হয়। হাতীর রাজা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে তুমি কে ? তুমি হ্রদে যাইতে নিষেধ করিতেছ কেন ?"

হাতীগুলির ভাব দেখিয়া লম্বকর্ণের সাহস বাড়িল। সে উত্তর করিল, "আমায় চিনিস্ না ? আমার নাম বিজয়দত্ত—আমি শশকদের রাজা, থাকি আমি চন্দ্রমণ্ডলে। আমি ভগবান চন্দ্র-দেবের নিকট হইতে আসিয়াছি—আমি তাঁহার দূত, তাঁহার কথা তোকে বলিতে আসিয়াছি। চন্দ্রদেব তোর উপর বড়ই

লম্বকর্ণ শশক হস্তীর রাজাকে কহিতেছে।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

চটিয়াছেন—এমন চটিয়াছেন যে হয়ত তোদের সকলকে ধ্বংস করিবেন। যদি ভাল চাস্, এখনও হ্রদে যাওয়া বন্ধ কর্। নচেৎ প্রাণে মারা যাইবি, গোষ্ঠীগোত্র সব মারা যাইবে। শাস্ত্রে লেখা আছে—"নিজের ও পরের জোর না বুঝিয়া যে বোকার মত কোন কাজ করে, তার যে পদে পদেই বিপদ ঘটে।" বুঝিলি তো, কথাটা কি? এখন যাহা ইচ্ছা করিতে হয়, কর্।"

হাতীর রাজা লম্বকর্ণের কথা শুনিয়া তো অবাক-অপ্রস্তুত। তাহার মুখে কথা নাই, বরং সে প্রাণে বিষম ভয়ই পাইল। শশকের নীতি কথাটা বড় উঁচুদরের, তাহা ঠেলিয়া ফেলিবারও বিষয় নয়। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চতুর্দ্দন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে শশক, অনেক কথাই শুনাইলে, অনেক ভয়ও দেখাইলে। জিজ্ঞাসা করি চন্দ্রদেবের স্পষ্ট আদেশটা কি? ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে তাঁহার আদেশ পালন করিবই। তাহার সহিত ঝগড়া বিবাদে আমাদের লাভ কি?"

শশক হাসিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে কহিল, "হা, হা, হা, এখনও স্পষ্ট আদেশ কি বুঝিলে না? তোমাকে কি চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হইবে? ভাল, আবারও আদেশটা খুলিয়া বলিতেছি,—দেখ বোঝ কি না? আদেশটা এই—ভগবান চন্দ্রদেব শুনিয়াছেন তুমি নাকি তোমার হাতীর দল লইয়া এই চন্দ্রহ্রদে যাও, সেখানে নামিয়া স্নান কর, জল ঘোলা কর, দৌড়াদৌড়ি-

লাফালাফি কর, পদ্ম নাশ কর, মৃণাল ভাঙ্গ ; আরও কত কি কর। হ্রদের পাড়ে অনেকগুলি খরগোস বাস করে। তোমাদের চলাফেরায় তাহাদের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে অনেক খরগোস মারা পড়ে। চন্দ্রদেব বলেন, হাতীর রাজার তো ইহা বড় অন্যায়! শশকেরা যে চন্দ্রদেবের পরিবারের মধ্যে। তিনি শশকগুলিকে কত ভালবাসেন, তা কি তুমি জান না? তিনি তাহাদিগকে কোলে করিয়া রাখেন, তাই তাঁহাকে লোকে বলে 'শশাঙ্ক', 'শশী', 'শশধর'। তোমরা তাঁহার পরিবারের লোক মারিতেছ, তাতেই তিনি বড় রাগ করিয়াছেন। তিনি এখনই তাহার একটা প্রতিকার করিতেন, কেবল রাগের মাথায় কিছু করাটা ভাল নয় বলিয়া করেন নাই। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, 'যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে আর দলবল লইয়া হ্রদে যাইও না,—জল ঘোলা করিও না,—শশকের বাড়ী ঘর পায়ে মাড়াইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিও না। এই তাঁহার খোলা হুকুম। যদি তাঁহার আদেশ না মান, তোমাদের বিস্তর কষ্ট ও লাঞ্ছনা হইবে। মানিয়া চলিলে যে তোমাদের কত উপকার হইবে, এক মুখে বলিতে পারি না। চন্দ্রমার কোপ ত জান, তিনি আর তোমাদিগকে জ্যোৎস্না দিবেন না—তোমরা রাত্রিতে চলা ফেরাও করিতে পারিবে না। আর তিনি যদি আলো না দেন, তবে কি হইবে জান? ভয়ানক গ্রীষ্ম হইবে, গরমে টিকিতে পারিবে না, ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রাণে মরিবে। তাঁহার আদেশ

মানিয়া চল, তিনি সুন্দর আলো দিবেন, তোমরা সুখে আহার-বিহার করিয়া কাল কাটাইতে পারিবে ।"

হাতীর রাজা শশকের কথা শুনিয়া তো স্তম্ভিত। সত্যই তাহার ভয় হইল। সে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল,—অবশেষে কহিল, "হাঁ, শশক, তোমার কথা সত্য। আমি ভগবান চন্দ্রমার নিকট বাস্তবিকই অপরাধ করিয়াছি। এখন এই অপরাধের উপায় কি ? চন্দ্রদেব যাহাতে রাগ ভুলিয়া যান, তুমি তার উপায় কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর তাঁহার রাগের কোন কাজ করিব না। চন্দ্রদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বড় সাধ। পারত তাঁহার কাছে আমাকে লইয়া চল, আমি আমার অপরাধের জন্য যোড় হাতে ক্ষমা চাহিব।"

শশক মৃদু হাসিয়া কহিল, "এখন বোধ হয় অপরাধ করিয়াছ কি না করিয়াছ, বুঝিতেছ ? যাহা হউক, এখনও যে অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাও মঙ্গল। চন্দ্রদেবের সহিত দেখা করিতে চাও, সেতো বেশ কথা। দেখা করিতে হইলে, আমার সঙ্গে একলা চল, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব। তার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।"

হাতীর রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "শশক, এখন চন্দ্রদেব কোথায় আছেন ? কোথায় গেলে তাঁহার দেখা পাইব ? আমি বাস্তবিকই তাঁহার সহিত দেখা করিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

শশকটা দুষ্ট কি না—সে মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “তিনি কোথায় আছেন, বুঝিতে পার না কি ? তিনি তাঁহার প্রিয়তম-সন্তান শশকদের নিকটে আছেন, তাহাদিগকে শোকে সান্ত্বনা দিতেছেন। তিনি এই হ্রদেই আছেন। এখান হইতেই তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।”

হাতীর রাজা শশকের কথা সরল ভাবে বুঝিল। সে উত্তর করিল, “যদি চন্দ্রদেব এই হ্রদে আসিয়া থাকেন, তবে তো ভালই হইয়াছে—আমার পরম সৌভাগ্য। এখনই আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল, প্রণাম করিয়া, স্তব স্তুতিতে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, নিজের ঘরে চলিয়া যাই।”

শশক কহিল, “হাঁ, তিনি এই হ্রদেই আছেন,—সেখানে গেলেই তাঁহার সহিত দেখা হইবে। তোমার দলবল এখানে থাকুক, তুমি একলা আমার সঙ্গে চল।”

উভয়ে হ্রদের দিকে চলিল। দৈবক্রমে সেদিন পূর্ণিমা, চন্দ্রদেবের সম্পূর্ণ উদয় হইবে। চন্দ্রদেব যখন পূর্ণ জ্যোতিতে উঠিয়াছেন, তখন হাতী ও শশক দুইজনে সেই হ্রদের তীরে যাইয়া উপস্থিত। চন্দ্রদেবের কি উজ্জ্বল মূর্ত্তি, কি সুন্দর তাঁর জ্যোৎস্না! হ্রদের জল একেত স্বচ্ছ,—তাহাতে আবার চন্দ্রের আলো পড়িয়াছে, হ্রদের জল যেন হাসিতেছে। একটু বায়ু বহিলে শত শত চন্দ্রের মুখ তাহাতে দেখা যাইতেছে। শশক তখন হাতীর রাজাকে চন্দ্রের ছায়া দেখাইয়া কহিল,—

"গজরাজ, ঐ দেখ চন্দ্রদেব জলের মধ্যে বসিয়া আছেন। তিনি যোগে মগ্ন, কাহারো সহিত কথা ক'ন না। এখন তাঁহার আলাপের যো নাই, অবকাশ নাই। তুমি দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাও। তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা করিলে তিনি যদি রাগ করেন, এই ভয় হয়। যা' হউক, তুমি আর বেশী ক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিও না।"

হ্রদের জল স্বচ্ছ, নির্ম্মল, স্ফটিকের মত—তাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়িয়াছে, হাতী কি আর স্থির থাকিতে পারে? শোভা দেখিয়া হাতীর রাজা আনন্দে গলিয়া গেল। সে অমনি হ্রদের জলে নামিয়া পড়িল, আর শুঁড় দিয়া জল ঘোলাইতে লাগিল। তখন আর তার ভয় নাই, ভয়ের কথা মনেও নাই। মনে আনন্দ হইলে জীব এমনই করে। শুঁড়ের তাড়নায় জলে লহরী ছুটিল,—শত শত চন্দ্রের মূর্ত্তি তাহাতে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। চপলার মত চন্দ্রের ছায়া এদিক ওদিক ছুটোছুটি করিতেছে দেখিয়া হাতীর রাজার দৃষ্টিভ্রম জন্মিল। লম্বকর্ণ দেখিল ভারি বিপদ। সে তখনই চীৎকার করিয়া কহিল,—

"ওহে গজরাজ, একি, তুমি করিতেছ কি? আসিয়াছ চন্দ্রদেবকে তুষ্ট করিতে, না তুমি তাঁহার কোপ যে আরও একশ গুণ বাড়াইয়া দিলে! আমার কিন্তু, ভাই, দোষ নাই, তুমি যা' ইচ্ছা কর। বিপদে পড়িলে তুমিই পড়িবে। আমি সাবধান করিলাম, আমাকে শেষে আর কোন দোষ দিতে পারিবে না।"

হাতীর রাজা লম্বকর্ণের কথায় আবার ভয় পাইল। সে নিরেট বোকাটির মত কহিল, "ভাই, আমার অপরাধ কি? কি এমন অন্যায় কাজ করিলাম যে, তিনি আমার উপর এত রাগ করিবেন? বড় সুন্দর জল,—আর এই সুন্দর জ্যোৎস্নার রাত,—হ্রদে না নামিয়া থাকিতে পারি না যে? তুমি ভাই, কোন দোষ নিও না।"

লম্বকর্ণ এইবার রাগ করিয়া কহিল, "তুমি কি এতই বোকা যে ভালমন্দ বুঝিতে পার না? শুঁড় দিয়া জল তোলপাড় করিলে, আবার বলিতেছ কোন অন্যায় কাজ কর নাই? জানিলে যে চন্দ্রদেব জলের মধ্যে ধ্যানে আছেন, তবু কথা না মানিয়া শুর শুর করিয়া জলে নামিয়া গেলে! ভালমন্দ যখন তোমার জ্ঞান নাই, তখন তোমার বড় বিপদ, বড় কুলক্ষণ—বোধ হয় তোমার বিপদ না হইয়া আর যায় না।"

হাতীর রাজা এবার বড় ভীত হইল। সে তখনই জল হইতে উঠিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইল। সে চন্দ্রদেবের অনেক স্তবস্তুতি করিল, তাঁহাকে অনেকবার প্রণাম করিল, তাঁহার নিকট অনেক-বার ক্ষমা চাহিল। অবশেষে লম্বকর্ণকে মিনতি করিয়া কহিল,—

"ভাই, আমার ত অপরাধই হইয়াছে। এখন তুমি আমার একটু উপকার কর। তুমি চন্দ্রদেবকে কহিবে তিনি যেন আমার উপর রাগ না করেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আর এমন কাজ করিব না। অধিক কি, আমি আর এই হ্রদে

আসিবই না। যদি আমাকে আর কখনো এ হ্রদের পাড়ে দেখিতে পাও, আমাকে দণ্ড করিও। এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর। তুমি কহিলে অবশ্যই চন্দ্রদেব আমাকে ক্ষমা করিবেন।”

লম্বকর্ণকে অনেক বলিয়া কহিয়া হাতীর রাজা হ্রদ হইতে চলিয়া গেল। সেই অবধি ভয়ে আর কোন হাতী সেই হ্রদে যাইত না। শশকেরা ইহাতে প্রাণে রক্ষা পাইল। তাহারা নিজেদের ঘরে থাকিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

কাক কহিল, ‘ভাবিয়া দেখ মহতের কি মহৎগুণ। তাঁর নামেও কার্য্যসিদ্ধি হয়।’

প্রধান গল্পারম্ভ।

‘মহতের মহৎ গুণ’, এই বিষযের গল্পটি শেষ করিয়া কাক পাখীদিগকে কহিল, “ভাই সকল, আমি তোমাদিগকে আরো একটি কথা কহিতেছি। কথাটা নেহাৎ ঠেলিয়া ফেলিবার নয়। যদি আপনাদের মঙ্গল চাও, তবে নীচ ব্যক্তিকে রাজা করিও না। অধম চিরকাল অধম, রাজা হইলেও তাহার স্বভাব শোধ্‌রায় না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, “নীচ, অলস, কাপুরুষ, বিলাসী ও অকৃতজ্ঞকে রাজা করিতে নাই; করিলে রাজ্যের অমঙ্গল, প্রজার অমঙ্গল—দেশের সর্ব্বনাশ।” তোমরা নীচ প্রভু হইতে সুবিচারের আশা করিও না, আশা করিলে ‘শশক ও কপিঞ্জলের’ মত দুর্গতি ভোগ করিয়া মরিতে হইবে।

পাখীরা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কেমন কথা? গল্পটি বল, ব্যাপার কি বোঝা যাক্।"

কাক তখন 'শশক ও কপিঞ্জলের' উপাখ্যানটি বলিতে আরম্ভ করিল।

শাখা গল্প ২—

শশক ও কপিঞ্জলের উপাখ্যান।

সে অনেক দিনের কথা—এক বনের মধ্যে একটা বটগাছ ছিল। আমি তাহার এক শাখায় বাস করিতাম। সেই গাছের নীচে এক কোটরে এক চড়াই পাখীও বাস করিত—তার নাম কপিঞ্জল। আমরা দুইজনেই দিনের বেলায় নানাস্থানে চরিয়া বেড়াইতাম, যেই সন্ধ্যা হইত, অমনি সেই বটগাছে ফিরিয়া আসিতাম। তখন কোন কাজকর্ম্ম থাকিত না, আমরা দুইজনে বসিয়া নানা গল্পগুজব করিতাম—তাহাতে এই জিনিসটা খুব ভাল, এই জিনিসটা ভাল নয়, এই গ্রাম ভাল, ঐ গ্রামটি ভাল নয়, এই রকমের কত গল্পই হইত। মোট কথা, তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসা দুই-ই হইত। আরও যে কত কথা হইত, তাহা আর কি বলিব। বাস্তবিক দুইজনের বড়ই মনের মিল হইয়াছিল,—আমরা বড় সুখে কাল কাটাইতাম। অধিক কি,

একজনে আর একজনকে না দেখিয়াও থাকিতে পারিতাম না। প্রাণের মিল হইলে এই রকমই হয় !

একবার আমরা তুইজনেই বাসার বাহির হইলাম। কপিঞ্জল খানিক দূরে যাইয়া আর আর কতকগুলি চড়াইয়ের সঙ্গে উড়িয়া চলিল, আমি আমার আহার খুঁজিতে এক দিকে চলিলাম। চড়াইয়েরা এমন এক স্থানে চলিয়া গেল যে সেখানে শস্যের আর শেষ নাই, তাহাদের ভারি আমোদ। সুখ এই, তাহারা প্রাণ ভরিয়া খাইতে পাইবে।

সন্ধ্যাতো হইয়া আসিল। আমি যাহা পাইলাম, তাহা খাইয়াই বটগাছে ফিরিয়া আসিলাম। আশায় রহিলাম, বন্ধু কপিঞ্জল কখন আসিবে, আজ খুব মজার গল্প হইবে।

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি হইল,—আরও রাত্রি হইল, কপিঞ্জল আর আসে না ! আমার বড় ভাবনা হইল। মনে করিলাম, হয়ত খুব ভাল জায়গায় যাইয়া পড়িয়াছে,—বন্ধুবান্ধবও মেল্লা-ই সঙ্গে আছে, সকলের সঙ্গে আসিতে রাত্রি হইতে পারে—বোধ হয় এখনই আসিবে। হায় ! আমার আশা বৃথাই হইল,—কপিঞ্জল ফিরিল না। রাত গভীর হইল,—প্রায় দুপুর পার হইয়া যায়, বন্ধুর সহিত দেখা নাই। ভাবনায় আমার ঘুম হইল না। একটু চুপ করিয়া থাকি, কোন কিছুর শব্দ হইলেই জিজ্ঞাসা করি, 'বন্ধু আসিয়াছ ?' কিন্তু উত্তর নাই। কত শব্দ হইল, কত ডাকিলাম, উত্তর নাই। বড় ভাবনা হইল, ভাবিতে

ভাবিতে আকুল হইলাম। মনে তখন অনুভব করিলাম, নিশ্চয়ই বন্ধুর কোন বিপদ হইয়াছে, তা' না হইলে এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই ফিরিয়া আসিত, রাতও ত আর কম হয় নাই!

মনে কত দুর্ভাবনাই হইতে লাগিল। কত অমঙ্গল ভাবই মনে আসিল। একবার মনে হইল—'বন্ধু বোধ হয় কোন ব্যাধের হাতে বদ্ধ হইয়াছে'। আবার মনে হইল,—'না, বোধ হয় কোন দুষ্ট লোক মারিয়া ফেলিয়াছে, যদি জীবিত থাকিত, তবে এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত। বন্ধু নিশ্চিত মারা গিয়াছে।'

মনে কত বত চিন্তাই আসিল,—দুর্ভাবনায় মন কতই তোলপাড় হইতে লাগিল। আমার মন ভাল নয়, আমার আর সেই রাত্রিতে ঘুম হইল না। কত কাঁদিলাম,—কত ভাবিলাম,—আমার বন্ধু আর ফিরিল না। রাত্রি গেল, তার পর দিন গেল, সেই দিনের রাত গেল,—এইরূপে আরও কয়েক দিন ও কয়েক রাত পার হইল, বন্ধুর আর দেখা নাই। আমি নিরাশ হইলাম,—আর কাঁদিলাম,—স্থির করিলাম বন্ধু নিশ্চিত মারা গিয়াছে। শোকে দুঃখে আমি একেবারে অবসন্ন হইলাম।

কয়েক দিন যায়,—এক দিন একটা শশক—নাম তার 'ত্বরিতগতি'—বন্ধু কপিঞ্জলের কোটরে আসিয়া উপস্থিত। সে অনায়াসে সেই শূন্য কোটর দখল করিয়া বসিল। তখন সূর্য্য অস্ত যায়-যায়, আমি মরে তখনই গাছে ফিরিয়া আসিয়াছি।

আমার মনটাও ভাল ছিল না—বন্ধুর শোকে আমি যেন তখন চেতনা-হারা, প্রাণ-হারা—খরগোসটাকে কোটরে দেখিয়াও আমার কোন কথা বাহির হইল না। খরগোসটা বেশ সুখে সেই কোটরে রহিল। আমি বন্ধুর বিরহে শোকে দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

কিছুদিন যায়, এক দিন বন্ধু কপিঞ্জল সেই গাছে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া আমার মন নাচিয়া উঠিল,—আমার বড় আনন্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বন্ধু, তুমি কেমনতর জীব যে এত দিন এখানে আস নাই? নিজের ঘর ভুলিয়া গিয়াছিলে, না রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছিলে?' বন্ধু কহিল, "একটা ভাল জায়গা মিলিয়াছিল,—সেখানে খাদ্যেরও অভাব ছিল না, তাই আসি নাই। আসিতে যাইতে তো সময় আর পরিশ্রমের দরকার, সেই জন্যই আসি নাই। তোমার খুব কষ্ট হইয়াছে, বন্ধু,—মনে কিছু করিও না।" আমি উত্তর করিলাম, 'আচ্ছা বেশ, আসিয়াছ ভালই করিয়াছ। এখন এখানে থাক, আবার দুইজনে সুখী হই। আমাকে ছাড়িয়া আরতো দূরে যাইবে না?'

বন্ধু উত্তরে কেবল 'না' বলিয়া আপন কোটরে প্রবেশ করিতে গেল। যাইয়াই তো সে অবাক। কপিঞ্জল দেখিল,—সেই কোটরে এক শশক বসিয়া আছে। সে ভারি গম্ভীর, মুখে তার কথা নাই। দেখিয়াই তো কপিঞ্জলের বড় রাগ হইল। সে রাগে

যেন গস্‌গস্‌ করিতে লাগিল। সে শশকটাকে অনেক ভৎর্সনা করিল,—অনেক মন্দ বলিল। অবশেষে সে কহিল, "ওহে শশক, তুমি আমার কোটরে বসিয়া আছ কেন? এ কোটর যে আমার। জোর করিয়া পরের ঘর দখল করা কি উচিত? আমি এখনও কহিতেছি, যদি ভাল চাও—কোটর ছাড়িয়া চলিয়া যাও।"

শশক কপিঞ্জলের কথায় মৃদু হাসিয়া কহিল, "হা, হা, হা, বেশ বলেছ, ভাই, বেশ বলেছ! তুমি তো ভারি পণ্ডিত! এ যে তোমার ঘর, তোমায় কে বলিল? তার নজির কি? এ ঘরে আমি বাস করিতেছি, এ ঘর আমারই। তবে কেন আমাকে অত অনুযোগ, অত গালাগালি করিতেছ? আমি অধিক কথা কহিতে চাই না—যদি ভাল চাও, এখনই সরিয়া পড়, নচেৎ তোমার বড় অমঙ্গল—বড় বিপদ।"

শশকের কথা শুনিয়া কপিঞ্জলের মাথায় বাজ পড়িল,—তার মাথা ঘুরিয়া গেল,—তার মুখে আর কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে কপিঞ্জল বলিল,"আমার ঘরে তুমি বাসা করিলে, জোর জবরদস্তি করিয়া বসিয়া রহিলে,—আরও বলিতেছ, আমারই অমঙ্গল হইবে? ইহা হইতে আর অধিক কি অমঙ্গল হইবে? ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, 'জোর যার মুলুক তার' এই কি বিধান? ভালমন্দের বিচার দুনিয়ায় হয়,—এই ঘর তোমার কি আমার, চল এক প্রতিবেশীকে সালিস মান্য করি। তিনি যে

মীমাংসা করিবেন, তা-ই দুই জনে মান্য করিয়া লইব। দেখা যা'ক, তোমারই অধিকার, না আমারই অধিকার!"

শশক বলবান পুরুষ,—বাহুবল তার অধিক। সে একটু উপহাস করিয়া কহিল, "আরে মূর্খ, সালিস বা মান্য করিব কারে, আর সে মীমাংসাই বা করিবে কি? স্মৃতির বচন তো আর কারো অমান্যের নয়? স্মৃতিতেই আছে, একজনের স্থাবর সম্পত্তিও যদি আর এক জনে দশ বৎসর অবাধে ভোগ করে, তবে সেই স্থাবর সম্পত্তিও তার হয়—অস্থাবর সম্পত্তির তো কথাই নাই। এই ক্ষেত্রে না লাগে সাক্ষী, না লাগে দলিল পত্র। নারদমুনি কি বলিয়াছেন, শুনিয়াছ? তিনি বলেন, 'মানুষের দশ বৎসর ভোগ দখল হইলে সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার নাই। আর পশু পক্ষীর বর্ত্তমান অধিকারই প্রধান প্রমাণ।' এ গৃহে আমি বাস করি, এ গৃহ আমার, ইহা শাস্ত্রে বলে, যুক্তিতে বলে। তোমার অধিকার কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ যুক্তিতে বলিবে? তুমি বড় বোকা, এখনও রাস্তা দেখ, ভাল হইবে।"

কপিঞ্জল নিরুপায় হইল। সে সাত পাঁচ ভাবিয়া কহিল, "আচ্ছা, ভাই শশক, তুমি শাস্ত্রের কথা, যুক্তির কথা তো কহিলে। শাস্ত্রতো আমি জানি না, স্মৃতি শাস্ত্রে কি আছে, তাহাও জানি না। স্মৃতিশাস্ত্র যে তুমিও জান, তা-ই বা বুঝি কি করিয়া? অতএব চল দুই জনেই কোন স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতের কাছে যাই, তিনি যে ব্যবস্থা দিবেন, তাই আমরা দুইজনে মানিয়া লইব।"

শশক বলশালী.—সে আর কি সহজে সালিস মানিতে চায় ? কপিঞ্জলের অনেক অনুরোধের পর শশক যাইতে স্বীকার করিল। দুই জনেই পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে চলিল। তাহাদের গোলমালে আমার কিন্তু ভারি আমোদ বোধ হইল। আমি ভাবিলাম, 'দেখিই না কেন, পণ্ডিতেই বা এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা করেন, কি প্রকারে দুই জনের ঝগড়া মিটাইয়া দেন।' আমার বড় কৌতূহল হইল,—আমি শশক ও কপিঞ্জলের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলাম।

দুই জনে কিছু দূরে চলিয়া গেল—দুই জনেরই খুব জিদ। শশক এবার কপিঞ্জলকে কহিল, "ভাই, পণ্ডিত তো দেশে আছেন অনেক। এখন যাঁকে নিকটে পাই, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত নয় কি ? এই এখানে এক বিড়াল আছেন—নাম দধিকর্ণ—খুব ভারি পণ্ডিত। তিনি এই গঙ্গার তীরেই বাস করেন, চল আমরা তাঁর কাছেই যাই। তিনি যে মীমাংসা করিবেন, তাতেই তোমার মত আছে তো ? তিনি কিন্তু খুব ভাল পণ্ডিত, তিনি ন্যায় বিচারই করিবেন। তোমার ভয় নাই, তিনি পক্ষপাত করিবেন না।"

কপিঞ্জল শশকের প্রস্তাবে সম্মত হইল। দুই জনেই বিড়াল পণ্ডিতের নিকট যাইতে লাগিল—প্রাণে ভয় নাই, আশঙ্কা নাই। কতকদূর যাইতে না যাইতেই তারা সেই বিড়াল পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। বিড়াল দেখিয়া শশক ও কপিঞ্জল

দুইজনেরই প্রাণে ভয় আসিল,—তাদের বুক 'দুর দুর' করিতে লাগিল। আর কি তাদের পা চলে? প্রাণে ভয় ও আশঙ্কা থাকিলে পা চলেও না। দুই জনেই ব্যাকুল হইল, দুই জনেই বলিতে লাগিল, "দূর হ'ক, চল ফিরিয়া যাই, আর বিধি ব্যবস্থার দরকার নাই। হাজার মহা পণ্ডিত হ'ক, বিড়াল যে জীব, ওর কাছে যাইতে নাই। বাঁকে পাইলে এখনই সে ধরিয়া খাইয়া ফেলিবে। চল, ফিরিয়া যাই, সালিসির আবশ্যক নাই। শাস্ত্রে আছে—"যে অধম, সে চিরকাল অধম, সে আর উত্তম হয় না। সে মহা পণ্ডিত, মহা তপস্বী, মহা সন্ন্যাসী হইলেও তাকে বিশ্বাস করিতে নাই। বিশ্বাস কর, প্রাণে মারা যাইবে।" শাস্ত্র অমান্য করা মহাপাপ। চল, দুই জনেই ফিরিয়া যাই, দুই জনেরই প্রাণ রক্ষা হ'ক।"

শশক ও কপিঞ্জলের মধ্যে যে কথা হইতেছিল, তাহা দধিকর্ণ শুনিতে পাইল। তার ভারি আনন্দ—সে তাদের কাছে মহা পণ্ডিত—সালিস কর্ত্তা, ব্যবস্থাদাতা! সে বড় চালাক —সে তখনই ভণ্ড-তপস্বী সাজিয়া বসিল। সে গঙ্গার তীরে গেল, সেখানে চোখ বুজিয়া, মুখ উচু করিয়া, ভারি বৈরাগ্যের ভাবে কহিতে লাগিল, "এ সংসার অসার, জীবন এই আছে তো এই নাই। বন্ধু বান্ধব তো স্বপ্নের মত,—কেউ কারো নয়। আত্মীয় স্বজন, ভাই ভগিনী, বাপ মা ভেল্কি মাত্র,— এই দেখ আছে, এই নাই—যেন জলের বুদ্বুদ। এ সংসারে আপনার কে? কে কাহার

উপকার করিতে পারে? কারো দ্বারা এসংসারে উপকারের আশা নাই। লোকের পরম পদার্থ ধর্ম্ম,—ধর্ম্মই জীবের সহায়। ধর্ম্ম ভিন্ন আর গতি নাই ইত্যাদি।”

দুই জনেই তো গঙ্গাতীরে যাইয়া বিড়াল-তপস্বীকে এইরূপ উক্তি করিতে শুনিল। দুই জনেই মনে করিল— বিড়াল তপস্বী হইয়াছে,—বোধ হয় পূর্ব্বের হিংসাভাব ছাড়িয়াছে,—তবে আর আমাদের ভয় কি? আর সে যেমন ধর্ম্মের কথা কহিতেছে!

শশক কিছু নির্ভীক হইয়া কহিল, “ওহে কপিঞ্জল, শুনিতেছ, বিড়াল-তপস্বী কেমন ধর্ম্মের কথা কহিতেছেন? বা, বেশ ধার্ম্মিক তো! ধার্ম্মিক না হইলে কি অমন ধর্ম্মের কথা কহিতে পারেন? চল, চল, দুই জনে যাইয়া উঁহার কাছেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি। এঁকে যেমন ধার্ম্মিক বোধ হইতেছে, ইঁনি ঠিক ব্যবস্থাই করিবেন।”

কপিঞ্জল সাধারণত বড় ভীরু, সে উত্তর করিল,—“ভাই, যাইতে চাহিতেছ চল। তবে বিড়াল কেমন জীব, জান তো? সে কিন্তু আমাদের চিরশত্রু। ধরিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। যদি একান্তই তাঁর ব্যবস্থা লইতে হয়,—দূর হইতে ব্যবস্থা লও, নিকটে যাইবার আবশ্যক নাই। কি জানি, যদি তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ হয়, তবে আর কারো প্রাণ থাকিবে না।”

ঠিক হইল, কেহ নিকটে যাইবে না, দূর হইতেই বিড়াল-

তপস্বীকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। উভয়ে তখন হাত যোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ঃ—

"তপস্বী মহাশয়, আপনি তো মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী,—শাস্ত্রে 'অদ্বিতীয়। আমরা এক ব্যবস্থার জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। বিবাদের কারণ শুনিয়া শাস্ত্র অনুসারে যে ব্যবস্থা হয়, করিয়া দিন, আমাদের বিবাদ মিটিয়া যা'ক। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—আপনার ব্যবস্থায় যে হারিবে, আপনি তাকেই খাইতে পাইবেন।"

দধিকর্ণ তো আর প্রকৃত সন্ন্যাসী নয়—ভণ্ড। সে এই কথা শুনিয়াই কাণে আঙ্গুল দিল, আর বলিল, "রাম, রাম, নারায়ণ, নারায়ণ, অমন কথা কি বলিতে আছে? আমার কাছে অমন কথা কহিও না। আমি বহু দিন অমন পাপ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন অহিংসাই আমার পরম ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "মশা মাছিকেও মারিতে নাই।" আমি ঠিক বিচার করিব, তোমাদের কোন ভয় নাই। একটি কথা, আমি বুড়ো হইয়াছি, কাণে আর আগেকার মত তেমন শুনিতে পাই না। দূর হইতে তোমরা কথা বলিলে আর কিছুই শুনিতে পাইব না। তোমাদের কোন ভয় নাই, আমার কাছে আসিয়া যা'র যা বলিবার বলিতে থাক। সমস্ত বিষয়টা না জানিলে তো আর বিচার হয় না? অপক্ষপাত বিচার না করিলে যে নরকে বাস হয়, জান তো? অতএব আমার কাণের কাছে আসিয়া যা'র যা বলিবার বলিয়া যাও।"

বিড়াল-তপস্বীর ভাবভঙ্গীতে আর কথাবার্ত্তায় বাদী প্রতি-বাদীর ভারি বিশ্বাস হইল। তা'রা ভয় দূর করিয়া তা'র কাণের কাছে আপন আপন কথা কহিতে গেল। বিড়ালতপস্বী খানিকক্ষণ সতর্ক হইয়া চুপ করিয়া রহিল। অবসর বুঝিয়া সে একজনকে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিল, আর একজনকে থাবা মারিয়া ধরিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে দুই জনেই বিড়াল-তপস্বীর হাতে পঞ্চত্ব পাইল।"

কাক কহিল, "এই জন্যই বলিতেছিলাম—নীচকে উচু স্থান দিতে নাই। নীচকে প্রভু করিলে দুর্দ্দশার এক শেষ হয়—সর্ব্বনাশ হয়। শশক ও কপিঞ্জলের দুর্দ্দশাই তা'র দৃষ্টান্ত। যদি তারা বিড়াল-তপস্বীর নিকট বিচার প্রার্থনা না করিত, তবে বোধ হয় তাহাদের এই দুর্গতি হইত না।"

(প্রধান গল্পারম্ভ)—

কাকটা আবার কহিল, "এখন বোধ হয় বুঝিতেছ, নীচকে রাজা করিতে নাই। আরও বুঝিয়া দেখ, তোমরা নিজেরা রাত্রিতে দেখিতে পাও না, মড়ার মত থাক। তা'র উপর যা'রা রাত্রিতে দেখিতে পায়, এমন জীবকে যদি রাজা কর, তবে কি আর রক্ষা আছে? তা' হইলে ঠিক শশক ও কপিঞ্জলের মত দুর্গতি লাভ করিবে। যাহা সত্য, যাহা শাস্ত্রসম্মত, আমি সবই কহিলাম, এখন তোমাদের ইচ্ছা। যা' ভাল বোঝ, তা'ই কর।"

কাক যে সকল কথা কহিল, তা' একবারে উড়াইয়া দিবার কথা নহে। পাখীরা কিন্তু তা'র কথা প্রাণে প্রাণে সত্য বোধ করিল। তখন তা'রা কহিল, "ইনি ভালই বলিয়াছেন, এ অতি উত্তম পরামর্শ। আমরা পেঁচাকে কখনও রাজা করিব না,—ঐ নীচকে রাজা করিলে দুর্গতির একশেষ হইবে, একেবারে প্রাণে মারা যাইব। আর দেরীর দরকার নাই, চল আমরা অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে রাজা করি গে।"

এই বলিয়া পাখীরা তো যে যার জায়গায় চলিয়া গেল। রহিল একা পেঁচা, আর তা'র স্ত্রী। অনেকক্ষণ চলিয়া যায়, আর কোন পাখীই ফিরিয়া আসিল না। পেঁচা ভাবিতে লাগিল, "এ কি? পাখীরা যে গেল, আর আসিল না কেন? রাজা হইব, শুভকাল যে চলিয়া যায়! আমার অভিষেকের যোগাড় কোথায়? ব্যাপার যে কি হইল, কিছুই যে বুঝিতে পারি না।"

পেঁচার বড় ভাবনা হইল। সে আর কোন উপায় না দেখিয়া আপনার দূতী কাকলাসকে কহিল,—"হ্যাগা দূতী, ব্যাপার কি? শুভলগ্ন চলিয়া যায়, অভিষেকের যে কোন যোগাড়ই নাই! হইল কি?"

কাকলাস প্রভুর নিকট আস্তে আস্তে কহিল,—"প্রভু, অভিষেকের আয়োজন দেখিবেন কি? এই কাকই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পাখীরা যাহাতে আপনাকে রাজা না করে, কাকটা সেই পরামর্শই দিয়াছে,—তাই তা'রা যে যার জায়গায় চলিয়া

গিয়াছে। আর তা'রা ফিরিয়া আসিবে না। ঐ দেখুন, কেবল কাকটা একলা, কি অভিপ্রায়ে জানি না, এখনও এখানে বসিয়া আছে। আপনি শীঘ্র উঠুন, আপনাকে আপনার ঘরে রাখিয়া আসি! দেরী করিলে এই কাকটা বা আপনার কোন অনিষ্ট করিয়া ফেলে।"

শুনিয়া পেঁচার ত ভারি রাগ। তা'র রাগ হইতেও পারে। এতো সামান্য ক্ষতি নয়? হইবে সে রাজা, তা'র ব্যাঘাত করিলে কা'র না রাগ হয়? পেঁচা তখন কাককে ডাকিয়া কহিল, "ওরে দুরাত্মা, এই কি তোর কাজ? আমি তোর নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তুই আমার এমনই সর্ব্বনাশ করিলি? আমি তোর এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি, যে তুই আমার রাজা হইবার পথে কাঁটা দিলি, অভিষেকে বিঘ্ন ঘটালি। ভাল, ভাল, আজ অবধি তোর সহিত আমার চির-শত্রুতা হইল। এই শত্রুতা শীঘ্র ফুরাইবে না, বংশে বংশে চলিবে। তোর ও তোর বংশের শেষ না করিয়া আর আমার প্রতিহিংসা কমিবে না।"

পেঁচার রাজার ভারি রাগ—রাগে সে আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। কাককে বারে বারে অভিসম্পাত করিয়া, গালি মন্দ দিয়া, পেঁচা দূতীকে লইয়া চলিয়া গেল।

কাকের মনে এবার দুঃখ আসিল। ভয় যে না হইল, তাও নয়। সে মনে মনে কহিল, "কাজটা ভাল হইল না। নিজের পায়েই কুড়ুল মারিলাম। খামখা এমন নিষ্ঠুর কথা

পঁচার রাজা ও কাক

না কহিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। সত্য যা তাই কহিয়াছি, তাতে যা' ঘটে ঘটুক। কিন্তু আমি লাভ করিলাম চির শত্রুতা, আমার বংশের সর্ব্বনাশ!"

কাকের মহাচিন্তা হইল। চিরশত্রুতা মনে করিয়া তা'র মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। ক্রমে নিরাশা আসিল, শেষে 'যা' হয় হ'ক' বলিয়া কাক চলিয়া গেল।

মন্ত্রী স্থিরবুদ্ধি রাজাকে কহিলেন, 'সেইদিন অবধিই আমাদের সহিত পেঁচাদের শত্রুতা,—তা' আর গেল না, যাইবেও না।'

শত্রুতার কারণের কথা শেষ হইল। সকলেই শত্রুতার কারণ জানিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কাকের রাজা মেঘবর্ণ স্থিরজীবীকে কহিল,---"পেঁচাদের সহিত যে আমাদের চিরশত্রুতা, তাতো বুঝিলাম। এখন উপায় কি? শত্রু-দমনতো আবশ্যক? তা' না হইলে মারা যাইতে তো বসিয়াছিই, একেবারে সবংশে নির্ব্বংশ হইব যে?"

স্থিরজীবা কহিলেন, "তোমরা ভয় করিও না,—আমি ছয় উপায়ের শেষ উপায় ধরিয়া শত্রু দমন করিব। যে চিরশত্রু, তা'কে যে কোন উপায়ে পরাজয় ও বধ করিতে হইবে। বঞ্চনা করিয়াও যদি কার্য্য উদ্ধার করিতে হয়, তাতেও পাপ নাই। মনে রাখিও ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততার কাছে কেহ আঁটিতে পারে না। বড় বড় পণ্ডিত বা বিজয়ী বীরকেও হার মানিতে হয়।

এই বিষয়ের একটা গল্প শুনিবে ? গল্পটি বেশ—এক 'সাগ্নিক' ব্রাহ্মণ ও ধূর্ত্তের গল্প। আমি সেই গল্প কহিতেছি, মনোযোগ করিয়া শোন।"

বৃদ্ধমন্ত্রী গল্পটি কহিতে লাগিলেন :—

শাখাগল্প ৩।

এক ব্রাহ্মণ ও ধূর্ত্তের উপাখ্যান।

"একটা গ্রাম ছিল, সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—নাম মিত্রশর্ম্মা। সেই ব্রাহ্মণ খুব ভাল ব্রাহ্মণ, লেখাপড়া বেশ ভাল জানিতেন। তিনি আগুনের পূজা করিতেন—আগুনকেই তিনি দেবতা মানিতেন। ব্রাহ্মণ দিন রাত্রি পূজা আহ্নিকে কাটাইতেন, পৃথিবীর অন্য কিছুর ধার ধারিতেন না। বড় সরল, বড় অমায়িক—পৃথিবীর ছলতর্ক তিনি জানিতেন না, বুঝিতেন না। তিনি যেন আর এক রকমের জীব ছিলেন।

একবার ব্রাহ্মণের বড় ইচ্ছা হইল মাঘ মাসের অমাবস্যায় খুব ভাল করিয়া পূজা করিবেন,তাহাতে একটি ছাগ বলি দিবেন। নানাবিধ জিনিষ পত্রের আয়োজন করিলেন, নানা ফুলের বন্দো· বস্ত করিলেন। যোড়শোপচারে পূজা করিবেন কি না,—ব্রাহ্মণের তো মহা আনন্দ। গ্রামের মধ্যে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁ'র খুব নাম—খুব যশ। পাড়া শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন এই

ছিল তাঁ'র ইচ্ছা। ব্রাহ্মণের প্রায় সকল জোগাড়ই ঠিক—কেবল একটি ছাগের অভাব। এক যজমান একটি ছাগ দিবেন বলিয়াছিলেন,—ধরিলে তাহাও এক প্রকার ঠিক।

অমাবস্যা আসিল। পূজার আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। কেবল ছাগটি আসিয়া পৌঁছায় নাই। ব্রাহ্মণের ভাবনাও বড় নাই,—যজমান তো ছাগ দিবেনই স্বীকার করিয়াছেন। যদি একান্ত তিনি না পাঠান, ব্রাহ্মণ নিজে যাইয়া লইয়া আসিবেন।

ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য—সেইদিন মহাদুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি, কেহ কি আর ঘরের বাহির হইতে পারে? সকলেই শীতে জলে অস্থির। যজমান এখনো পাঁটাটি পাঠান নাই। ব্রাহ্মণের ঘরে পূজা, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? যে প্রকারেই হউক পূজা তো শেষ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া ঘরের বাহির হইলেন,—যাইবেন পাঁটা আনিতে, আব একগ্রামে সেই যজমানের বাড়ী। ব্রাহ্মণের কষ্টের সীমা নাই, জল কাদা ভাঙ্গিয়া তিনি তো যজমানের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। যজমান দেখিয়া অবাক, ব্রাহ্মণের কি কষ্ট!

যজমানের বড় লজ্জা হইল, তিনি তখনই একটী সুন্দর সবল পাঁটা পুরোহিতকে দান করিলেন। পুরোহিতের বড়ই আনন্দ, এত কষ্ট যেন তাঁহার সার্থক হইল। ষোড়শোপচারে পূজা হইবে ভাবিয়া ব্রাহ্মণের আজ কত

আহ্লাদ! ভক্তের প্রাণ বিহিত পূজা হইলে বড়ই আনন্দিত হয়!

ঝড় বৃষ্টি থামিল না। ব্রাহ্মণ সেই জল-ঝড়ের মধ্যেই বাড়ী চলিলেন। তাঁহার হাতে পাঁটার গলার দাড়—তাহা ধরিয়া তিনি টানিতে লাগিলেন, পাঁটা আর জল ঝড়ে যাইতে চাহে না,—'ভ্যা, ভ্যা' করিতে করিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পাঁটাটাও খুব সবল, তাহার টানাটানিতে ব্রাহ্মণ কাতর হইলেন, —পথ আর চলিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ দেখিলেন ভারি বেগতিক, পাঁটাকে হাঁটাইয়া নেওয়াওতো মুস্কিল। তিনি অমনি উহাকে কাঁধে ফেলিয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলিলেন। তাঁহার বাসনা, কোন প্রকারে বাড়ী পৌঁছাইতে পারিলেই হয়।

ঝড় বৃষ্টি একটু থামিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ সোজা চলিয়াছেন। সেই পথ দিয়া তিন জন লোক আসিতেছিল,—তাহারা বদ্-লোক,—ধূর্ত্ত। তাহারা দেখিল, একজন ব্রাহ্মণ একটা মোটা-সোটা পাঁটা কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন,পাঁটাটা বেশ সুন্দর, —পাঁটাটার উপর তাহাদের লোভ হইল। তখন একে অপরকে কহিতে লাগিল,—"ওরে দেখিতেছিস্ একটা বামণ একটা পাঁটা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। পাঁটাটা কি সুন্দর—কি মোটা সোটা! ব্রাহ্মণকে ঠকাইয়া পাঁটাটা হাতড়াইতে পারিলে ভারি মজা। আজ বড় শীত—তাহাতে ঝড় বৃষ্টি, পাঁটার মাংস খাইতে পারিলে অনেকটা সুবিধা,—শীতের কষ্টটা তো কিছু দূর হয়।"

সকলেই বদ্‌লোক—ধূর্ত্তদের তখনই পরামর্শ হইল ব্রাহ্মণকে ঠকাইয়া পাঁটাটি আত্মসাৎ করিতে হইবে। তখনি একজন সোজা রাস্তা ধরিয়া আপনার পোষাক বদ্‌লাইয়া,ব্রাহ্মণের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। সে কহিতে লাগিল, "পণ্ডিত মহাশয়! একি? আপনি জ্ঞানী, বিদ্বান, আপনার এ কেমন কাজ? বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া একটা কুকুর কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন? ছি, ছি, লোকে দেখিলে আপনাকে কি বলিবে? কুকুর কি কেউ ছোঁয়? উহাকে ছুঁইলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়! আপনি কিনা সেই কুকুরটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন! আপনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, অগ্নির উপাসক,—ঋষিতুল্য। আপনার এ কাজতো বড় নিন্দার—এখনো কেউ দেখে নাই,—কুকুরটা ফেলে দিন, ফেলে দিন, এখনি ফেলে দিন, কেউ দেখিলে আপনার জাত থাকিবে না।"

ধূর্ত্তের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণতো অবাক্। লোকটা মিছা কথা কহিতেছে দেখিয়া তাঁহার ভয়ানক রাগও হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি কি বলিতেছ? তুমি কি অন্ধ, চোখে দেখিতে পাওনা? দেখ দেখি এটা কি,—কুকুর না পাঁটা? তুমি বোধ হয়, কোন জন্মে পাঁটা দেখ নাই? ছি, ছি, তুমি অমন কথা আর কহিও না,—আমি এই পাঁটা পূজায় দিব।"

ধূর্ত্ত হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর মহাশয়, রাগ করিবেন না। ইহা পাঁটাই বটে! আমার বলা ভারি অন্যায় হইয়াছে, আপনি

এই পাঁটা লইয়া যাইয়া পূজায় দিন! লোকে আপনাকে বেশ ভাল বলিবে।"

ধূর্ত্ত এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ আবার পাঁটাটিকে কাঁধে ফেলিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই দ্বিতীয় ধূর্ত্ত তাঁহার কাছে আসিল। সে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আহা, বামণ ঠাকুরের কি কষ্ট! স্নেহ করিতেন বাছুরটাকে,—তা' বলিয়া কি মড়াটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে হয়? বামণ ঠাকুর, আপনি শাস্ত্র জানেন,—মহাপণ্ডিত লোক। আপনার একি কাজ? শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কি পশুপক্ষীর মড়া ছুঁইতে নাই,—ছুঁইলে পঞ্চগব্য খাইতে হয়, চন্দ্রায়ণ করিতে হয়। আপনি কেন মরা বাছুরটা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন? ফেলে দিন,—ফেলে দিন,—লোকে দেখিলে আপনাকে কেউ ছুঁইবে না, আপনার জাত যাইবে।"

ধূর্ত্তটার কথায় ব্রাহ্মণ খুব রাগিয়া গেলেন। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আরে তুমিও কি অন্ধ? আমি লইয়া যাইতেছি পাঁটা, আর তুমি বলিতেছ এটা একটা মরা বাছুর! চোখের মাথা কি একেবারেই খাইয়াছ? ছি, ছি, অমন কথা আর বলিও না,—এ পূজার পাঁটা, পূজায় দিব।"

ধূর্ত্ত জোড় হাতে কহিল, "ঠাকুর, রাগ করিবেন না। আচ্ছা, আমি যেন ভুলই কহিয়াছি, আপনি যা-ইচ্ছা-তা বলিয়া গালি

দিন্। ভাল কথা কহিলে শুনিবেন না, আমি করিব কি ? লোকে দেখিলে যে আপনার জাত যাইবে, কেউ আপনার হাতের জল খাইবে না !"

ধূর্ত্ত চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কিছু গ্রাহ্য না করিয়া বনের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। এই সময়ে তৃতীয় ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "ছি, ছি, ঠাকুর, ছি ! আপনি ব্রাহ্মণ—বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। আপনি তো বড় অন্যায় কাজ করিতেছেন ? লোকে দেখিলে আপনাকে বলিবে কি ? আপনার যে জাত যাইবে ! আপনি যাগযজ্ঞ করেন—আগুনের উপাসনা করেন—অগ্নিহোত্রী। আপনি কিনা একটা গাধার বাচ্ছা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন ? আপনি এইটাকে এখনই ত্যাগ করুন্। আপনার বড় পাপ হইয়াছে,—আপনি যান, এখনই পরণের কাপড় সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া ঘরে যান। এখনও বেশী লোকে দেখে নাই, আর দেরী করিবেন না, দেখিলে 'একঘরে' হইবেন।"

ব্রাহ্মণতো অবাক্-অপ্রস্তুত। তাঁহার বুদ্ধি ঘোলাইয়া গেল। তিনি রাগে পাঁটাটাকে গাধা মনে করিয়া তখনই দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বড় ভয় হইল,—জাতি যাওয়ার ভয় কি না— তিনি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বাড়ীর দিকে পলাইয়া গেলেন !

ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততার ফল ফলিল, তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইল। তাহারা বোকা ব্রাহ্মণকে ঠকাইয়া পাঁটাটি লাভ করিল। উহার মাংস খাইয়া তাহারা মহা আনন্দিত হইল।"

(প্রধান গল্পারম্ভ)—

গল্পটি শেষ হইল। বৃদ্ধ স্থিরজীবী কহিলেন, "বৎস, ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা দেখিলে তো? ধূর্ত্তের প্রতারণায় না পড়ে এমন লোক খুব কম। শত্রুও যে প্রতারিত হইবে, সন্দেহ নাই।' আরো কথা, শত্রুর সংখ্যা অধিক নহে—তাহাদের দলবল বেশী হইলে আশঙ্কার বিষয় হইত। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন,—'দুর্ব্বলের দল বেশী হইলে, তাহার সহিতও বিবাদ করা উচিত নয়।' সংখ্যায় বেশী হইলে, দুর্ব্বলের কাছেও প্রবল পরাজিত হয়। এই বিষয়েও এক গল্প কহিতেছি, মনোযোগ করিয়া শোন।

স্থিরবুদ্ধি গল্পটি বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

শাখা গল্প ৪।

কালো সাপ ও পিপ্‌ড়ের উপাখ্যান।

"এক বনের মধ্যে এক উইঢিপি ছিল—ঢিপিটি বড় মন্দ নয়। তাহাতে গর্ত্ত করিয়া একটা বড় সাপ থাকিত—তার নাম ছিল 'অতিদর্প'। উইয়ের ঢিপি, তাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেঁদা। কিন্তু সাপটার বাহির হইবার জন্য বড় একটা দুয়ার ছিল। উইয়ের ঢিপি কিনা, তাহাতে নিত্য নূতন মাটি জন্মায়। একদিন সাপটা গর্ত্তে আছে, উইয়েরা তাহার বড় দুয়ারটি

মাটিতে বন্ধ করিয়া ফেলিল। সাপটাতো আর গর্ত্ত হইতে বাহির হইতে পারে না। তার ভারি কষ্ট। বেলাও হইয়াছে, ক্ষুধাও পাইয়াছে, সে গর্ত্ত হইতে বাহির হইবার জন্য বড় উতলা হইল। অনেকক্ষণ খুঁড়িয়াও আর বাহির হইবার দুয়ার পাইল না। সাপটা উপায় না পাইয়া ক্ষুদ্র একটা গর্ত্ত দিয়াই গলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সাপ বড়, গর্ত্ত ছোট, বাহির হওয়াতো সোজা নয়,—ভারি কষ্ট। তবু সাপটা কোন রকমে বাহির হইতে লাগিল। তাহাতে তাহার শরীরের অনেক স্থানে ঘা হইল,—রক্ত বাহির হইল। পিপ্‌ড়ে রক্তখোর,—রক্তের গন্ধ খুব টের পায়। তাহারা 'পিল্‌পিল্' করিয়া রক্তের দিকে ছুটিল। একটা দুটা করিয়া লাখে লাখে পিপ্‌ড়ে সাপটার গায়ে ছাইয়া পড়িল। সাপটা ছট্‌ফট্ করে—এদিক ওদিক চলে,—কত ল্যাজ আছ্‌ড়ায়,—পিপ্‌ড়েরা আর সরে না। ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সাপটা চলে,—যেখানে যায় সেখানেই লাখে লাখে পিপ্‌ড়ে তাহার ঘা আসিয়া ধরে। দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘাগুলি বেশ বড় করিয়া ফেলিল। ঘা আর শুকাইল না, সাপটা শেষে পচিতে পচিতে মরিয়া গেল।"

(প্রধান গল্পারম্ভ।)

স্থিরজীবী গল্পটি শেষ করিয়া কহিলেন, "কেমন বুঝিলেতো দুর্ব্বলও সংখ্যায় বাড়িলে কত প্রবল! তোমরা ভয় পাইও

না, আমি যেমন করিতে বলি, তেমন কর, দেখিবে কাজে ফল হইবে, শত্রু বিনষ্ট হইবে।”

মেঘবর্ণ ভারি খুসী। ভরসা পাইলে কিন্তু সকলেই খুসী হয়। তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রীকে কহিলেন, “হাঁ, অবশ্যই আপনার কথা শুনিব, যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।”

স্থিরজীবী কহিলেন, “আমি যে উপায়ের কথা কহিতেছি, তাহা শোন। উপায়টি অতি সোজা—তোমাদের কোন ভয় নাই। দেখিও আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। প্রথমে তোমরা সকলে আমাকে যারপরনাই গালাগালি করিবে। কেউ জিজ্ঞাসা করিলে কারণ বলিবে—আমি বিপক্ষের পক্ষ। খুব গালাগালির পর আমাকে মারিতে আসিবে। এমনভাবে মারিতে আসিবে শত্রুরা যেন বোঝে আমি তাদের পক্ষ বলিয়া তোমরা আমাকে মারিতেছ। খুব ঠোঁট্ দিয়া ঠোকরাইবে,—একবারে রক্তারক্তি করিয়া দিবে। যখন আমি অচেতন হইয়া পড়িব দেখিবে, তখন তোমরা আমাকে বটগাছটার নীচে ফেলিয়া আসিবে। তুমি তারপরই পরিবার লইয়া ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে থাকিবে।

আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া শত্রুরা আমাকে দেখিতে আসিবে। আমি নানা কৌশলে তখন তাহাদের বিশ্বাস লওয়াইতে চেষ্টা করিব যে, আমি তাহাদের পক্ষ বলিয়া তোমরা আমার এ দশা করিয়াছ। তাহারা আমার দুঃখে দুঃখিত হইবে, তাহারা

আমাকে তাহাদের আপনার করিয়া লইবে। তখন সুবিধা বুঝিয়া শত্রুদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে ফন্দি করিব। আমার মতে ইহা হইতে সুন্দর উপায় আর নাই। কৌশলক্রমে যদি শত্রুর দুর্গ রক্ষিশূন্য হইয়া পড়ে, তবে তাদের মারিয়া ফেলিতে কতক্ষণ? আমার প্রতি দয়া না দেখাইয়া আমি যেমন বলিলাম, তেমনি ব্যবহার করিতে থাক।”

পরামর্শ ঠিক হইল। মেঘবর্ণের সহিত বৃদ্ধ মন্ত্রীর কলহ হইতে লাগিল—ক্রমে ঘোর বিবাদ, তারপর মারামারি। কাকেরা স্থিরজীবীকে বেদম প্রহার করিল। পাকসাটে ও ঠোকরে তাঁহাকে আধমরা করিল। স্থিরজীবী তখন মূর্চ্ছার ভাব দেখাইলেন। তবু কাকেরা ঠোক্‌রাইতে ঠোক্‌রাইতে রক্তারক্তি করিয়া দিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীতো একবারে যেন অজ্ঞান। তখন কাকেরা তাঁহাকে বটগাছের নীচে ফেলিয়া দিল। মেঘবর্ণ-রাজা পরিবার লইয়া ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে পলাইয়া গেলেন।

সেখানে ছিল একটা মেয়ে-কাকলাস। সে ছিল পেঁচার রাজার দূতী,—সে স্বচক্ষে এই ঘটনাগুলি দেখিয়াছিল। তখনি সে পেঁচার রাজার কাছে যাইয়া জানাইল, “মহারাজ, আপনার ভয়ে শত্রুরা পরিবার লইয়া পলাইয়াছে। আর আমাদের ভয় নাই।—শত্রু পলাইয়াছে, আমাদের সুখেরই কথা।”

দূতীর কথা শুনিয়া সকলে বড় খুসী। তখন তাহারা সকলে সেই বটগাছের কাছে উড়িয়া আসিল। গাছে একটীও কাক

নাই, সব পলাইয়াছে। পেঁচার রাজা অরিমর্দ্দনের আহ্লাদ দেখে কে! তিনি সেই বটগাছে যাইয়া বসিলেন, দেখিলেন কাকের নাম-গন্ধও নাই। তখন রাজা কহিলেন, "ওহে তোমরা বসিয়া থাকিও না, শত্রুরা কোথায় গেল খোঁজ কর। কোন্‌দিকে, কোথায় গিয়াছে, জানিতে পারিলে সেখানে যাইয়া তাদের বংশ নাশ করিয়া আসিব।"

স্থিরজীবী পেঁচাগুলির কাণ্ড দেখিতেছিলেন। যখন শুনিলেন তাহারা কাকের সন্ধানে নানাস্থানে যাইবে, তখন 'গো, গো' শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহার অর্থ পেঁচাগুলির দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করা। শব্দ শুনিয়াই পেঁচারা উড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল—তাঁহাকে প্রায় মারিয়া ফেলিবার মত করিল।

স্থিরজীবী বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে পেঁচাগুলিকে কহিলেন, "ওগো শোন, শোন, আমি তোমাদের শত্রু মেঘবর্ণের মন্ত্রী—স্থিরজীবী আমার নাম। দেখ মেঘবর্ণ আমাকে কি দুরবস্থা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।—আমার দোষ, আমি তোমাদের পক্ষে কথা কহিয়াছিলাম। গুণ থাকিলে শত্রুরও প্রশংসা করিতে হয়। আমি তোমাদের গুণেরই প্রশংসা করিয়াছিলাম। তাই আজ আমার এই অবস্থা,—আমার মৃত্যু ত অবধারিত। কখন যে মরি ঠিক নাই, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা তোমাদের রাজাকে একবার দেখি। যাঁহার জন্য এই অবস্থা, তাঁহাকে

দেখিয়া মরিলে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না। যদি দয়া হয়, আমার কাতর প্রার্থনা তোমাদের রাজাকে যাইয়া জানাও। আরো বলিবে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ গোপনীয় কথা আছে,—সে কথা শুনিলে তাঁহারই উপকার হইবে।"

পেঁচারা তখনই রাজার নিকট যাই[illegible] জানাইল। তিনি বড় অবাক হইলেন, মনে মনে ভাবি[illegible] বটে, আমার জন্য তার এই দুর্দ্দশা? লোকটাতো তবে [illegible]দের বড় হিতৈষী, তাহার কথা শুনিতেই হইবে।" রাজ[illegible] স্থিরজীবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজার বড় দুঃখ হইল। আহা! বৃদ্ধ যে অতি কাতর, তাঁর কথা কহিবার শক্তি নাই,—তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা, তাঁর হাত পায়ে কোন বল নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এমন দুরবস্থা হইল কেন?"

স্থিরজীবী অতি কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমার দুর্দ্দশার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কারণতো আপনি। আপনিতো মেঘবর্ণের বংশ ধ্বংস করেন। তিনি কাল ঠিক করিলেন আপনার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিবেনই—তাঁর যে কত রাগ, তা' আর কি বলিব। আমি যুদ্ধ করিতে বাধা দিলাম, বলিলাম,—'মহারাজ, আপনি অতি হীনবল, পেঁচার রাজা প্রবল পরাক্রান্ত, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। আমার মতে কিছু ক্ষতি হইলেও তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে পারিলে আপনারই উপকার।"

দুরাত্মা কাকের রাজা আমার উপদেশ বড়ই মন্দ ভাবিলেন। তিনি বড় রাগিয়া উঠিলেন,—বিপক্ষের পক্ষ বলিয়া আমাকে গালি মন্দ দিতে দিতে মারিতে আরম্ভ করিলেন। কি বেদম মার, দেখুন আমার শরীর একেবারে পিষিয়া দিয়াছে,—ঠোক্‌রাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছে। দেখুন আমার চলিবার শক্তি নাই, উড়িবার শক্তি নাই, হয়ত কিছু ক্ষণের মধ্যেই মরিয়া যাইব। আপনার কাছে ভিক্ষা, যদি কোন প্রকারে আমার প্রাণ বাঁচাইতে পারেন, আমি চিরকাল গোলাম হইয়া থাকিব। একটু চলিতে পারিলেই আমি আপনাকে দুরাত্মার ঘর দেখাইয়া দিব, একেবারে গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলকে বিনাশ করিতে পারিবেন। তবেই পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমি আনন্দে তাঁহার যাতনা দেখিব। ঈশ্বর কি সেদিন করিবেন ?”

পেঁচার রাজা অরিমর্দ্দন নিজেতো আর তেমন ভুখোড় নন, তিনি পরামর্শের জন্য পাঁচজন মন্ত্রী ডাকিলেন—রক্তাক্ষ, ক্রূরাক্ষ, দীপ্তাক্ষ, বক্রনাস ও প্রাকারকর্ণ। রাজা রক্তাক্ষের মত জিজ্ঞাসা করিতে কহিলেন,—

“মন্ত্রিবর, এই লোকটা আমাদের চিরশত্রু কাকের রাজার মন্ত্রী। আমাদের পক্ষ টানিয়া কথা কহিয়াছিলেন, তাই নাকি রাজা তাঁহাকে এই দশা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। এই ব্যক্তি আশ্রয় চান, আরো বলেন সুস্থ হইলে শত্রু বিনাশের পথ দেখাইয়া দিবেন। এখন কি করা উচিত ?”

রক্তাক্ষ শুনিয়াই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি খুব গলা উচু করিয়া দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "মহারাজ, এই বিষয়ে পরামর্শ কি, তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? এখনই বিনা বিচারে ইহাকে মারিয়া ফেলুন। এ শত্রুকে আশ্রয় দিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, সকলের প্রাণ যাইবে। লোকে বলে 'উপস্থিত ত্যাগ করিতে নাই।' শত্রুবধই আমাদের কাজ, এখনই উহাকে মারিয়া ফেলুন। শাস্ত্রে বলে, 'মিত্র শত্রু হইলে আর কখনো মিত্র হয় না।' শত্রুকে মিত্র ভাবিলে কি বিপদ হয়, তাহার একটা গল্প শুনিবেন?"

সকলে বলিয়া উঠিল,—'বলুন, বলুন, গল্পটি বলুন।' রক্তাক্ষ গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

শাখা গল্প ৫।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কালসাপের উপাখ্যান।

"কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বড় দরিদ্র —অতি কষ্টে তাঁহার সংসার চলে। ব্রাহ্মণের নাম হরিদত্ত। দরিদ্র কিনা—তিনি বিদ্যা শিখিতে পারেন নাই,—আচার নিষ্ঠা ও রাখিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা।—এই ব্রাহ্মণ তার কিছুই করিতেন না। তিনি চাষ আবাদ করিয়া কোন রকমে পরিবার পালন করিতেন।

একদিন সন্ধ্যা হইল, ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন ক্ষেতে কাজকর্ম্ম করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইলেন। ঘুমে চোখ ভাঙ্গিয়া আসিল, ব্রাহ্মণ আপন ক্ষেতের একটা গাছের তলে শুইয়া পড়িলেন। তখনও ঘুম হয় নাই,—ব্রাহ্মণের চোখ এক উইঢিপির উপর পড়িল। ব্রাহ্মণ তখনই থতমত খাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, একটা সাপ কুলোর মত ফণা ধরিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বড় ভীষণ সাপ—দেখিলে গা কাঁটা দেয়, বুক শুকাইয়া যায়!

ব্রাহ্মণের ঘুম গেল, বুক 'দুর্ দুর্' করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন,—'যেমন ভয়ানক সাপ, তাতে বোধ হয় ইনি এই ক্ষেতের দেবতা হইবেন। আমি বড় নরাধম; তাই এই সাক্ষাৎ দেবতাকে কখনো পূজা করি নাই। চাষবাসে যে আমার দুঃখ দূর হয় না, ইহার কারণও বোধ হয় এই। আজ অবধি আমি এই দেবতাকে পূজা করিব।"

এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ এক স্থান হইতে এক সরা দুধ আনিয়া সেই সাপের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন, আর মনে মনে অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, "আপনি এই ক্ষেতের দেবতা, আপনি এখানে বাস করেন, আমি আগে ইহা জানিতাম না। এতদিন আপনার পূজা করিতে যে পারি নাই, আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। আমায় ক্ষমা করুন্।"

রাত্রি হইয়াছে, ব্রাহ্মণ আর দেরী করিলেন না, তিনি

সেই দুধের সরা সাপের সম্মুখে রাখিয়াই তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

আর আর দিনের মত ব্রাহ্মণ তারপর দিনও সকালে ক্ষেতে গেলেন। তিনি তো অবাক্—তিনি দেখিলেন, সরাতে দুধ নাই, কেবল একটি মোহর পড়িয়া রহিয়াছে! ব্রাহ্মণ বড় গরীব, মোহর দেখিয়া তাঁর বড়ই আহ্লাদ হইল, তিনি তাহা উঠাইয়া লইলেন, আর এক সরা দুধ আনিয়া সাপের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ তার পরদিনও ক্ষেতে গেলেন,—আগ্রহও খুব, আজ কি হয়। যাইয়া দেখেন সেই দিনও সরাতে একটি মোহর পড়িয়া রহিয়াছে!

এইরূপে কয়েক দিন চলিল। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এক সরা দুধ রাখেন, আর তার পরদিন একটি মোহর পান।

একদিন ব্রাহ্মণের বড় কাজ, তাঁকে আর এক গ্রামে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ আপনার ছেলেকে বলিলেন, "অমুক যায়গায় এক সরা দুধ রাখিয়া দিস্, আর আমি যদি আজ না ফিরি, কাল সকালে সেই সরাতে যা পাইবি, তা বাড়ী লইয়া আসিস্; খবরদার কাকেও কিছু বলিস্ নি।"

ব্রাহ্মণ কাজে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ছেলেটি এক সরা দুধ সেই যায়গায় রাখিয়া আসিল। সেই দিন ব্রাহ্মণ আর বাড়ীতে ফিরিলেন না; পরদিন সকালে ব্রাহ্মণের ছেলে দুধের সরার নিকট গেল। সে অবাক্ হইল, একবারে আনন্দে অধীর

হইল—এ যে সরাতে একটা মোহর! সে মনে করিল, এই উইয়ের ঢিপির মধ্যে নিশ্চয়ই মোহর লুকানো আছে। যদি সাপটাকে মারিয়া ফেলিতে পারি, তবে বিস্তর মোহর লাভ হইবে!

ব্রাহ্মণের ছেলের দুর্বুদ্ধি ঘটিল। সে পরদিন এক সরা দুধ লইয়া ক্ষেতে গেল। সঙ্গে নিল একটা লাঠি। তার ইচ্ছা সাপটাকে মারিয়া ফেলিবে। দুধ নিবেদন করিলে সাপ বাহির হইল। যেমনি তাকে দেখা, অমনি ছেলেটা সাপের মাথায় এক ঘা লাঠি মারিল। দৈবের ঘটনা,—সেই আঘাতে সাপের কিছু হইল না। সে আঘাত পাইয়া রাগে গর্জ্জিতে লাগিল, আর তখনি ব্রাহ্মণ-কুমারকে এক কামড় দিল! সে কামড় কি কামড়, ব্রাহ্মণের ছেলেটি তখনই মরিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ বাড়ী নাই, তাঁর আত্মীয়েরা মরা ছেলেকে সেই ক্ষেতের কিছু দূরে পোড়াইতে লইয়া গেল। পোড়ান প্রায় শেষ হইয়া আসিলে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। আত্মীয়দের মুখে তিনি সবই শুনিলেন। ব্রাহ্মণ বড় শোক পাইলেন বটে, কিন্তু সাপের কাজটা অন্যায় হয় নাই,—ভাবিলেন। 'যেমনি কর্ম্ম, তেমনি ফল' ভাবিয়া ব্রাহ্মণ মনে আর কোন দুঃখ করিলেন না।

ব্রাহ্মণ স্থির হইলেন। তিনি আত্মীয়দের কহিলেন, "যে আশ্রিতের উপর দয়া না দেখায়, পদ্মবনের হাঁসের ন্যায় তাঁর সর্ব্বনাশ হয়।"

সকলে বলিয়া উঠিল,—"সে কেমন কথা? বলুন, বলুন, গল্পটি শুনি।"

ব্রাহ্মণ গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন :—

শাখা গল্প ৬—

পদ্মবনের হাঁসের উপাখ্যান।

"এক যে ছিল দেশ, তার রাজার নাম চিত্ররথ। তাঁর একটা বড় সুন্দর দীঘি ছিল। তাতে নিত্যই বিস্তর সুন্দর পদ্ম-ফুল ফুটিত। রাজা আদর করিয়া সেই দীঘিটাকে 'পদ্মসাগর' ডাকিতেন। দীঘিটা বেশ বড়সড়, তাতে কতকগুলি রাজহাঁস বাস করিত।—রাজহাঁসগুলির ডানা ছিল সমস্তই সোনার। মহাসুখে রাজহাঁসেরা দীঘিতে থাকে,—আর ছয় ছয় মাস পরে এক একটী পালক ত্যাগ করে। সোনার পালক—বড় দামী। রাজা এই সোনার হাঁসগুলিকে খুব যত্নে রক্ষা করেন।

দৈবের ঘটনা, একদিন উড়িতে উড়িতে আর একটা সোনার পাখী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। রাজহাঁসেরা তাহাকে দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। তারা বলিল, "এই দীঘি আমাদের একচেটিয়া,—তুমি আবার এখানে আসিলে কেন? এখানে অন্যের স্থান নাই। আরো শোন, রাজার সঙ্গে আমাদের

বন্দোবস্ত এই, ছয় ছয় মাসে আমরা এক একটী সোনার পালক ত্যাগ করিব। সেই পালকের বড় দাম,—তা' রাজার প্রাপ্য। তোমার তেমন পালক ত্যাগের ক্ষমতা আছে কি ?"

এই রকম অনেক কথার কাটাকাটি হইল—ক্রমে মহা বিবাদ, পরে মারামারি। নূতন পাখী একলা, সে অতগুলি রাজহাঁসের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কেন ? সে পলাইয়া গেল,—আর একেবারে রাজার কাছে যাইয়া শরণ লইল। সে রাজার কাছে সোনার রাজহাঁসগুলির কুব্যবহার কহিতে কহিতে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, পদ্মসাগরের হাঁসদের এমন অহঙ্কার যে তারা বলে 'রাজা আমাদের কি করিতে পারেন ? রাজার কথা আমরা শুনি না, মানি না। রাজা বলিলেও আমরা এখানে কারো থাকিতে দেই না।' আমি কহিলাম, 'রাজাকে মান না, এ কথা কি ভাল ? তোমরা এমন রাজবিদ্বেষী, আমি এখনই একথা রাজাকে যাইয়া বলিব।' তারা এতে একটুকুও ভয় পাইল না, বরং আরো কত গালাগালি করিতে লাগিল। তাই আমি মহারাজকে এ সব কথা বলিতে আসিয়াছি, এখন মহারাজের যেমন অভিপ্রায়।"

নূতন পাখীটার কথা শুনিয়া রাজার আর রাগের সীমা নাই। তিনি রাজহাঁসগুলিকে শিক্ষা দিতে পণ করিলেন। ভৃত্য-দের উপর আদেশ হইল,—তারা তখনই পদ্মসাগরে যাইবে আর যত রাজহাঁস আছে, তাদের মাথা রাজার নিকট লইয়া

আসিবে। চাকরেরা মোটা মোটা লাঠি লইয়া পদ্মসাগরে গেল, রাজহাঁসেরা দেখিয়া বড়ই ভীত হইল।

একটা ছিল বুড়ো রাজহাঁস,—তার বুদ্ধিসুদ্ধিও বেশ। সে সকলকে ডাকিয়া কহিল—'ব্যাপার বড় গুরুতর,—লক্ষণ বড় ভাল নয়। চল আমরা সকলে মিলিয়া এ বেলা উড়িয়া যাই, নতুবা সকলের প্রাণ যাইবে।'

রাজহাঁসেরা বুড়োর কথায় সম্মত হইল। বুড়োর কথা মানিতে হয়, ইহা যে শাস্ত্রের কথা। সকলে দীঘি ছাড়িয়া পলাইয়া প্রাণে রক্ষা পাইল, কিন্তু তেমন সুখ আর তাদের ভাগ্যে হইল না। অন্য জলাশয়ে যাইয়া তারা ক্রমে মরিতে লাগিল। নিজেদের সর্ব্বনাশ করিল, তবু আশ্রিতকে একটু স্থান দিল না!

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।—

গল্পটি শেষ হইল। ব্রাহ্মণ কোন শোক না করিয়া কহিলেন, "কেমন, আশ্রিতকে আশ্রয় না দিলে যে সর্ব্বনাশ হয়, তা' এখন বুঝিলে তো?"

সেই দিন কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ আগেকার মত এক সরা দুধ লইয়া ক্ষেতে গমন করিলেন। সাপের সম্মুখে সেই দুধের সরা রাখিয়া ব্রাহ্মণ অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। সাপটা উইয়ের ঢিপির পিছনে লুকাইয়া ছিল। সে ব্রাহ্মণের

কান্না শুনিতে পাইল। পুত্রশোকের কান্না, বড় নিদারু'। সাপের প্রাণেও কষ্ট হইল। সে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিল :--

"ব্রাহ্মণ, অর্থই তোমার সর্ব্বস্ব—ধর্ম্ম, মোক্ষ। তুমি অর্থে পুত্রশোক ভুলিয়াছ। কিন্তু তোমার সহিত আমার আর মিত্রতা হইবে না। অর্থলোভে তোমার ছেলে আমাকে লাঠি মারিয়াছে, যন্ত্রণায় আমি কামড়াইয়াছি। সেই আঘাত আমি ভুলিতে পারি নাই, তুমিও পুত্রশোক ভুলিতে পারিবে না। কাজেই রাগের মাথায় কে কি করিব, ঠিক নাই। এখন আমাদের দুই জনেরই ছাড়াছাড়ি হওয়া উচিত। আমি তোমাকে এই মণির হার দিতেছি, উহা লইয়া বাড়ী যাও, আর এখানে আসিও না।"

হার দান করিয়াই সাপ গর্ত্তে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ হার পাইয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু নিজের ছেলের বুদ্ধিকে মন্দ বলিতে বলিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ।—

মন্ত্রী রক্তাক্ষ কহিলেন, "তাই বলিতেছিলাম, মিত্রতা একবার ভঙ্গ হইলে আর তাহা হয় না। অতএব, মহারাজ, এই শত্রুর মন্ত্রীকে এখনই মারিয়া ফেলুন, আপনি শত্রুশূন্য হইবেন। ইহাকে আশ্রয় দিলে সবংশে মারা যাইবেন।"

পেঁচার রাজা তখন ক্রূরাক্ষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী

উত্তরে কহিলেন, "মহারাজ, রক্তাক্ষ বড় নির্দ্দয়, তার দয়া মায়া নাই। যে শরণ লয়, তাকে কি মারিতে হয়? বিশেষ এতো আপনার সাক্ষাৎ শত্রু নয়। শরণ লইলে সাক্ষাৎ শত্রুকেও আশ্রয় দিতে হয়। তাতে যদি প্রাণ যায়, তা'ও ভাল। এই বিষয়ে এক পায়রার উপাখ্যান বলিতেছি, শুনিতে থাকুন।

ক্রূরাক্ষ গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন :—

শাখা গল্প ৭—

পায়রা ও ব্যাধের উপাখ্যান।

"এক ছিল ব্যাধ—সে বনে বনে ঘুরিত আর পাখী মারিত। —এতে তার কোন দয়া মায়া হইত না,—দুঃখও হইত না! তার বন্ধু বান্ধবেরা সেইজন্য তাকে দেখিতে পারিত না, খুব ঘৃণাই করিত। ঘৃণা করিলে কি হইবে? সে জাল দড়ি লইয়া রোজ রোজই বনে বেড়াইত আর পাখী ধরিত। এই ছিল তার একমাত্র উপজীবিকা, সে আর করিবে কি? পেট চলা তো চাই!

এক দিন ব্যাধ তো বনে বনে ঘুরিতে লাগিল, কিছুই আর তার জালে পড়ে না। তার বড় ভাবনা হইল। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা একটা পায়রাণী আসিয়া তার জালে পড়িল। ব্যাধের মহা আনন্দ,—সেই দিনের জন্য তো তার আর পেটের ভাবনা নাই! সে পায়রাণীটিকে ধরিয়া এক খাঁচায় পুরিয়া রাখিল।

দৈবের ঘটনা,—দেখিতে দেখিতে ঘোর মেঘ হইল—পৃথিবী অন্ধকার হইয়া আসিল। ফল হইল—মুষলধারে বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ। প্রবল ঝড় বহিল। ব্যাধের মাথা রাখিবার স্থান নাই, —বনের মধ্যে সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। তার প্রাণ যায়-যায় হইল। সে আশ্রয়ের জন্য এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। ব্যাধ নিরুপায় হইয়া এক বট গাছের কাছে যাইয়া উপস্থিত। বড় ঝড়—ব্যাধ প্রাণ বাঁচাইতে অস্থির হইয়া পড়িল। সে হাতের খাঁচা মাটিতে রাখিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিল—

"যদি এখানে কেহ থাক, শীঘ্র এস, আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ যে যায়! শরণ লইতেছি, আমায় রক্ষা কর। এই দেখ, শীতে শরীর অবশ হইয়াছে, ক্ষুধায় জ্ঞান লোপ হইতেছে, আর যে কথা কহিতে পারি না। কে আছ, রক্ষা কর।"

সেই গাছের কোটরে থাকিত একটা পায়রা। সে ব্যাধের কাতর বিলাপ শুনিতে পাইল। কান্না দেখিলে সহজেই লোকের কান্না পায়। ব্যাধের কান্না দেখিয়া পায়রাও বিলাপ করিতে লাগিল, —"হায়, এই সময়ে আমার কপোতী কোথায়? সে এখনও যে আসিল না। যে বিষম ঝড় বৃষ্টি, হয় ত সে প্রাণ হারাইয়াছে। আজ তার অভাবে এই গৃহ শূন্য,—পৃথিবী শূন্য। সে কি আমার যেমন তেমন স্ত্রী—বড় পতিপ্রাণা,—বড় সরলা। পূর্ব্ব জন্মের কত পুণ্য যে এমন স্ত্রী পাইয়াছিলাম। শাস্ত্রকারেরা

কহেন, 'সে পুরুষই ধন্য—যাঁর স্ত্রী পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা।' যার গুণে আমি ধন্য, বুঝি বিধাতা তাকে হরণ করিলেন।"

খাঁচায় ছিল কপোতী—সে স্বামীর বিলাপ শুনিয়া কহিল,—"যে স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে না পারে, সে স্ত্রী স্ত্রী-ই নয়। স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা। একমাত্র স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই সকল দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে স্ত্রীতে স্বামী সুখী নন্, তার জীবন ধারণও বিড়ম্বনা। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র সুখদাতা। এমন স্বামীকে যে স্ত্রী পূজা না করে, সে অধম।

"যা' হউক্, নাথ, এক কথা তোমাকে বলি। প্রাণ দিয়াও শরণাগতের প্রাণ রক্ষা করিতে হয়। এই যে ব্যাধ,—সে তোমার অতিথি, আশ্রয় চাহিতেছে। শীতে ক্ষুধায় ইহার প্রাণ যায়-যায়। তুমি অতিথির পূজা কর, অতিথি যে দেবতা। সন্ধ্যাকালে অতিথি ফিরাইলে বড় দোষ। এই ব্যাধ তোমার স্ত্রীকে বদ্ধ করিয়াছে,—ওর উপর রাগ করিও না। আমি নিজ কর্ম্মফলেই আবদ্ধ হইয়াছি। এতে ওর কোন অপরাধ নাই। আমার জন্য দুঃখ করিও না, ধর্ম্মে মন দাও, আর এই অতিথির পূজা করিতে চেষ্টা কর।"

স্ত্রীর কথায় স্বামীর যেন দুঃখ দূরে গেল। সে ব্যাধকে কহিল, "ভদ্র, তোমার কি করিতে হইবে, অনুমতি কর। তোমার কোন ভয় নাই, এই বাড়ীকে তোমার নিজের বাড়ী মনে কর।"

ব্যাধ পায়রার কথা শুনিয়া কহিল, "আমার বড় শীত পাই-য়াছে,—আগে আমাকে শীত হইতে উদ্ধার কর।"

পায়রাটি তখনই আগুন জ্বালিয়া দিল। আগুনের তাপে ব্যাধের শীত দূর হইল। পায়রা তখন কহিল, "ভদ্র, আমার বড় পোড়াকপাল, আমার ঘরে এমন কিছুই নাই যে তা' দিয়া তোমার মত অতিথির পূজা করি। জন্ম এমন নীচ কুলে যে নিজের উদর পোষণ করিতেও পারি না যে অতিথিকে অন্নদান করিতে না পারে, তার জীবন বৃথা। হায়, কেহ চাহিলে 'নাই' বলা কি দুঃখের! তুমি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছ, একটু অপেক্ষা কর, আমি আগুনে প্রবেশ করি, আমাকে খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, এতে আমিও ধন্য হইব।"

পায়রা আগুনে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া ব্যাধ বড়ই কাতর হইল। সে মনে মনে ভাবিল, "আমি তো চিরকাল এই কুকর্ম্মই করিলাম। কত যে নরক ভুগিব, ঠিক নাই। আজ এই পায়রা আমাকে দিব্যজ্ঞান দিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ অবধি এমন কুকর্ম্ম আর করিব না।"

ব্যাধ জাল, দড়ি দূরে ফেলিয়া দিল, খাঁচা হইতে পায়রাণীকে ছাড়িয়া দিল। পায়রাণীর কত আর্ত্তনাদ,কত দুঃখ! স্বামী আগুনে পুড়িয়া মরিল, ইহা কি স্ত্রীর সহ্য হয়? সেও আগুনে ঝাঁপ দিতে চলিল। সে কহিল,"নাথ, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর জীবন বৃথা। আমি আর বাঁচিতে চাইনা, আমি তোমার সহিত যাইব।"

কপোতী জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ তার দেবমূর্ত্তি হইল। কপোতী দেখিল কপোত দেবযানে চড়িয়া স্বর্গে যাইতেছে। উভয়ে স্বর্গে যাইয়া অনন্ত সুখে রহিল।

ব্যাধের জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইল। পাপ দূর করিতে সেও দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিল। আর তার পাপ রহিল না, সেও স্বর্গ লাভ করিল।

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ।—

পেঁচার রাজা অরিমর্দ্দন ক্রূরাক্ষের উপদেশ তো শুনিলেন। তিনি কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি মন্ত্রী দীপ্তাক্ষের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন।

দীপ্তাক্ষ ধর্ম্মভীরু লোক, জীববধে তাঁর বড় অমত। তিনি কহিলেন, "এই লোকটাকে মারা উচিত নয়। আচ্ছা, যে আশ্রয় লইয়াছে, তাকে কি মারিতে হয়? শরণাগতকে মারা ধর্ম্মে বলে না, শাস্ত্রেও বলে না। এই লোকটার কি দুর্দ্দশা! শত্রু তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কত অত্যাচার করিয়া এই অবস্থা করিয়াছে, তাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করাই উচিত। এই সময় ইহাকে রক্ষা করিলে, সে চিরকাল বাধ্য থাকিবে, আমাদের শত্রুনাশেরও অনেক সুবিধা হইবে। আমার মতে, মহারাজ, ইহাকে রক্ষা করুন, মারিবেন না।"

দীপ্তাক্ষের মত হইল স্থিরজীবীকে প্রাণে রক্ষা করা। রাজা অন্যমন্ত্রী বক্রনাসকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বক্রনাস সোজা লোক, তিনিও মারিয়া ফেলিবার অমত করিলেন। তিনি কহিলেন, "মহারাজ, এই লোকটাকে মারা উচিত নয়। শত্রু-দের মধ্যে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইলেই আমাদের মঙ্গল। শত্রুপক্ষের কারো হাত করিতে না পারিলে কি আর শত্রুনাশ করা যায়? এ বিষয়ে একটি গল্প আছে, বলিতেছি ঃ—

শাখা গল্প ৮—

এক চোর ও রাক্ষসের উপাখ্যান।

"এক যে দেশ, সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বড় গরীব, সকল দিন দুমুঠো ভাতও তাঁর যুটিত না। ব্রাহ্মণের কয়েক ঘর যজমান ছিল। তাদের একজনের ছিল কিছু দয়া। সে পুরোহিতের অত কষ্ট দেখিয়া দুটি গরুর বাছুর কিনিয়া দিল। ইচ্ছা, বাছুর বড় হইলে ব্রাহ্মণ দুধ পাইবে, তাঁর কষ্ট কিছু দূর হইবে। ব্রাহ্মণের তো খুব কষ্টই, তিনি বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করেন আর খান। এই ভিক্ষা দ্বারা গরুর বাছুর দুটিকেও পুষিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ অনেক সময়ে নিজে না খাইয়াও বাছুর দুটোকে খাওয়ান। বাছুর দুটো ব্রাহ্মণের যত্নে বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিল।

এক যে চোর, সে বাছুর দুটি দেখিল। তার হইল লোভ। সে বাছুর দুটোকে চুরি করিতে ইচ্ছা করিল। সে ঠিক করিল, দিনটা থাক, রাতের বেলায় যাইয়া বাছুর দুটোকে চুরি করিয়া লইয়া আসিব।

রাত্রি আসিল। চোর দড়ি লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে চলিল, মনে মহা আনন্দ। প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা গেলে চোরটা একটা লোক দেখিতে পাইল। সে কি লোক—যেন কাল-পুরুষ—মোটা মোটা হাত, মোটা মোটা পা,—যেন এক শ' হাত লম্বা; চক্ষু কি, যেন জবা ফুল। তার হাতে মুগুর, হা করিয়া পথ আগুলিয়া আছে! চোর এই পুরুষ দেখিয়া তো প্রাণে মরিয়া গেল, তার হাত পা আর উঠে না, নড়ে না। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল,—তার হাত হইতে দড়ি পড়িয়া গেল, পা'র কাঁপনি আর কমে না। চোরের মুখে কথা কি আর বাহির হয়? তবু জোর করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে'? জিজ্ঞাসা করিয়াই যেন সে অজ্ঞান, অসার!

বিরাট-পুরুষ উত্তর করিল,—"আমি ব্রহ্মরাক্ষস,—আমার নাম সত্যবচন। তুমি কে হে, বাপু? তোমার পরিচয় শুনিতে পাই কি?"

চোর উত্তর করিবে কি? তবে একটা উত্তর তো করা চাই, নাহিলে সেই কালপুরুষ ছাড়িবে কেন? মিথ্যা বলিলেও যে রক্ষা নাই।—চোর ঠিক করিল, 'সত্য কহিব, যা' হয় হউক'। সে

উত্তর করিল, 'আপনাকে আর কি বলিব, আমি চোর,—বড় বদমায়েস, বড় দুষ্টু। আমি লোভী, আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুটি বাছুর চুরি করিয়া আনিতে চলিয়াছি।"

ব্রহ্মরাক্ষস চোরটার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা' বেশ ভালই হইয়াছে, তোমাকে পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। আহা, আজ সমস্ত দিন উপবাস, কিছু আহার হয় নাই; বুঝিয়াছিলাম, আজ বুঝি আর আহার যুটিবে না। তোমাকে পাইয়া আমার সেই ভয়টা দূরে গেল। আমরা দুই জনেই লোভী, চল দুই জনেই সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী যাই। আমি প্রথমে সেই ব্রাহ্মণকে খাইব, পরে তুমি বাছুর দুটি লইয়া আসিও।"

কথা ঠিক-ঠাক হইল। দুই জনেই সেই গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী গেল। দুই জনেই সেই বাড়ীর এক কোণে লুকাইয়া রহিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল—কখন রাত বেশী হইবে।

অনেক রাত হইল। ব্রাহ্মণ ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ব্রহ্মরাক্ষস তাঁকে খাইতে চাহিল। চোর বাধা দিয়া কহিল,—"একি কর, একি কর? এ তোমার যে ভারি অন্যায়! আমি আগে গরু দুটি লইয়া পলাই, তার পরে তুমি তাকে খাইয়া ফেলিও।"

ব্রহ্মরাক্ষস বাধা দিয়া কহিল, "এও কি হইতে পারে? গরু দুটো লইয়া যাইবার সময় শব্দ হইবেই। সেই শব্দে ব্রাহ্মণ জাগিবে, তা' হইলে কি আর আমার খাওয়া হইবে?"

চোর বড় সেয়ানা, সে কহিল, 'ব্রাহ্মণকে খাইতে গেলে গোলও তো হইতে পারে, তা' হইলে আমার তো আর গরু দুটো চুরি করা হইবে না। আমার কথা এই—আমি আগে গরু লইয়া চলিয়া যাই, তার পর তুমি যা'-ইচ্ছা-তা' কর।"

উভয়ের মধ্যে ভারি গোল বাধিল। এ বলে আমি আমার কাজ আগে করি, ও বলে আমি আমার কাজ আগে করি। ভারি ঝুটোপটি আরম্ভ হইল,—ক্রমে বচসা, পরে বিবাদ, গালাগালি, আর মারামারি। ঘোর কোলাহল শুনিয়া ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গিল,—সে ঘরের বাহির হইল।

চোর ব্রাহ্মণকে কহিল, "বাওন ঠাকুর, এই যে পাহাড়ের মত মানুষটা দেখিতেছ, এ মানুষ নয়—ব্রহ্মরাক্ষস, তোমাকে খাইতে আসিয়াছে।"

রাক্ষসও তখন বলিয়া ফেলিল, "ঠাকুর, ওতো আমার কথা ঢের বলিয়া ফেলিল। ওকে তুমি চেন? ও যে চোর,—গরু চোর—তোমার গরু চুরি করিতে আসিয়াছে। ওর কথা বিশ্বাস করিও না।"

শুনিয়া তো ব্রাহ্মণের আত্মা শুকাইয়া গেল, তাঁর মুখে রা নাই। মনে মুখে ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে তিনি প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁর হাতের কাছে ছিল এক গাছা লাঠি, তিনি সেই লাঠি লইয়া ব্রহ্মরাক্ষস ও চোরকে

ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে তাড়াইয়া দিলেন। ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ সেদিন প্রাণে রক্ষা পাইলেন।

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ।—

বক্রনাস কহিলেন, "কেমন, মহারাজ, বুঝিলেন তো, শত্রুর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে কি ফল হয়? এই মন্ত্রীকে রক্ষা করুন, আমাদের উপকার হইবে।"

ইহার পর পেঁচার রাজা অন্য মন্ত্রী প্রাকারকর্ণকে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, আমার মতেও ইহাকে বধ করা উচিত হয় না। একে বাঁচাইলে ভবিষ্যতে আমাদের ঢের উপকার। এর সঙ্গে যদি আমাদের খাতির হয়, দেখিবেন আমাদের কত বড় সুবিধা হয়। আর যদি একে মারিয়া ফেলি, আমাদের দুই পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইবে। এই বিষয়ের এক সুন্দর গল্প আছে, বলিতেছি শুনুন;—

শাখা গল্প ৯—

দুই রাজকুমারীর উপাখ্যান।

এক যে ছিল নগর, সেখানে ছিল এক রাজা। রাজার নাম দেবশক্তি। সেই রাজার একটিমাত্র ছেলে ছিল। রাজকুমার খুব

আদরের, খুব সুখে থাকেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, কি রকম করিয়া একটা সাপ তাঁর পেটে ঢুকিয়া যায়। সাপ পেটে ঢোকা অবধি, রাজকুমারের আর সুখ নাই, সোয়াস্তি নাই। রাজার ছেলে, রাজভোগ খান, কত ভাল ভাল জিনিস তাঁর জন্য আসে। রাজকুমার খানও খুব, কিন্তু শরীর আর মোটা হয় না,—এত যে খাওয়া-দাওয়া কোথায় যেন চলিয়া যায়! তিনি শুকাইতে লাগিলেন।—শুকাইলেনও এমন, যে প্রায় কঙ্কাল-সার। এখন রাজকুমার আর বেশী চলিতে পারেন না, এমনই দুর্ব্বল হইলেন।

রাজার ছেলের অমন অসুখ,—নগরে খুব হুলস্থূল পড়িল। চিকিৎসকেরও অন্ত নাই, চিকিৎসারও কসুর নাই। ঔষধ-পত্রের তো অভাব নাই-ই। রাজা কোন চিকিৎসারই বাকী রাখিলেন না। সোণার বড়ি, রূপার বড়ি, প্রবাল মুক্তার বড়ি, কঙ্কুম কস্তুরির বড়ি, কোন ঔষধেরই অভাব নাই। অবশেষে কত ওঝা রোঝা, কত টোট্‌কা টাট্‌কি, কত জলপড়া, কত শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কত ধন্নার ব্যবস্থা হইল। রাজকুমারের ব্যারাম আর কিছুতেই সারে না। তিনি রোজ রোজ বেশী জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। রাজা অবধি রাজবাড়ীর চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত সকলেই রাজপুত্রের জীবনে হতাশ হইলেন। নগরে আর কারোর যেন সুখ শান্তি নাই, রাজকুমারের জন্য সকলেই ভাবনাযুক্ত। রাজা রাণী দিন রাত কাঁদেন, কিন্তু কাঁদিলে কি

আর ব্যারাম সারে? আরো সকলে আশ্চর্য্য হইল যে কোন চিকিৎসকই রাজকুমারের যে কি ব্যারাম, ঠিক ধরিতে পারিলেন না। কেউ বলেন এই ব্যারাম, কেই বলেন ঐ ব্যারাম—এদিকে রাজকুমারের শরীরে কোন ব্যাধিই দেখা যায় না,—না জ্বর, না পেটে অসুখ, না প্লীহা-যকৃৎ!

এই রকম যাঁর অবস্থা, তাঁর কি কিছু ভাল লাগে? পৃথিবী যেন তাঁর কাছে ঘোর অশান্তির স্থান, যেন আগুনের কুণ্ড। রাজকুমার জীবনে হতাশ হইয়া তাহাই ভাবিলেন। তাঁর কিছু ভাল লাগে না, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'মরণ হইলেই এখন মঙ্গল।' তিনি রাজার সমস্ত সুখ ভোগ ছাড়িলেন। না এখন ভাল খান-দান, না কোন পোষাক গায়ে পরেন। রাজকুমার ঠিক করিলেন, সন্ন্যাসী হইবেন। যখন মনে প্রাণে সুখ নাই, তখন রাজার সুখ-ভোগেই বা দরকার কি? তিনি হইলেন সন্ন্যাসী,—খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, স্নান নাই, ঘুম নাই—তিনি কেবল ভাবেন, 'মরিব কবে?'

রাজা আর রাণীর কথা কি তিনি শোনেন? কারো মানা গ্রাহ্য না করিয়া রাজকুমার নগর ছাড়িলেন, দেশ ছাড়িলেন; কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া গেলেন। বিদেশে বিপাকে কে এক অপরিচিত—বিশেষতঃ রুগ্নকে আশ্রয় দেয়? রাজকুমার অগত্যা এক দেবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সেখানে মাটিতে শুইয়া থাকেন, আর কায়ক্লেশে ভিক্ষা করিয়া যা' পান, তাতেই

কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করেন। রাজপুত্রের কষ্ট হইলেও তিনি আর সেই কষ্টকে কষ্ট মনে করেন না। জীবনে হতাশ হইলে লোকে এমনই করে!

রাজপুত্র যে রাজ্যে এখন গেছেন, সেই রাজ্যের রাজার নাম বালী। তাঁর দুটী মেয়ে ছিল—খুব সুন্দরী,—সবে তাঁরা যৌবনে পা দিয়াছেন। রাজকুমারী কি না, তাঁদের সুখের সীমা নাই। কিন্তু তাঁদের পিতৃভক্তি ছিল, তাঁরা প্রতিদিন ভোরে উঠেন, আর রাজার চরণে যাইয়া প্রণাম করেন। তবে দুই মেয়ের মধ্যে অনেকটা তফাৎ ছিল,—একজনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আর একজনের জ্ঞান অসীম,—একজন মানুষের উপর নির্ভর করেন, আর একজন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন।

রাজার বড়-মেয়ে প্রণাম করিয়াই রাজাকে কহিতেন, "আমার যত সুখভোগ, তার মূলই আপনি। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া রাজ্য ভোগ করিলেই আমি চিরকাল সুখী থাকিতে পারিব।" ছোট-মেয়েটি বাপের বড় খোসামুদে ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "এ সংসারে কে কারে সুখ দিতে পারে সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করে। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ফল পায়। রাজা হউন, আর মহারাজই হউন, কেহই কর্ম্মকে খণ্ডন করিতে পারেন না।"

রোজই দুই মেয়ে দুই রকম কথা কহিতেন, রাজা কিন্তু

ছোট মেয়ের উপর বড় চটিতেন। একদিন দুই মেয়েই প্রণাম করিতে আসিলেন, বড় মেয়ে বরাবর যেমন বলেন, তেমনি বলিলেন। রাজা খুব খুসী হইলেন। ছোট-মেয়ে তাঁর যেমন বরাবরের কথা, তেমনই কহিলেন। রাজা আজ বড়ই রাগিয়া গেলেন,—এমন রাগ তাঁর আর কখনো হয় নাই। পারিলে তিনি ছোট-মেয়েকে তখনই মারিয়া ফেলেন।

রাজার রাগ সহজে থামিল না। তিনি ঠিক করিলেন,“মেয়েটা যে—এমন কথা বলে, তা' সত্য কি না পরীক্ষা করিব। ওর উপরই তা' পরীক্ষা করিব। এত বড় বাঁদর মেয়ে যে আমার মুখের উপর এমন কথা বলে ?”

রাজা তখন তখনই মন্ত্রীদের ডাকাইলেন। তাঁহারা আসিলেন। রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“আমার ছোট-মেয়েটার কথা-বার্ত্তা বড় ভাল নয়। ও বলে সকলে নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। ওকে এখনই কোন উদাসীনের হাতে দিয়া এস, দেখি এই মুখরা মেয়েটা কেমন নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে। যাও, এখনই মেয়েটাকে আমার বাড়ী থেকে লইয়া যাও, আর যে হুকুম করিলাম, সেই হুকুমের কাজ কর।”

রাজার হুকুম,—না মানিলে নয়। অমান্য করিলে কি মাথা থাকিবে ? মন্ত্রীরা তখনই ছোট-রাজকুমারীকে লইয়া চলিলেন। রাজকুমারীর কিন্তু দুঃখ নাই, কান্না নাই, তিনি নিজ কর্ম্মফল ভাবিয়াই স্থির রহিলেন। মন্ত্রীরা নগর ছাড়িলেন,

গেলেন অনেক দূর। উদাসীনও দেখেন না, মেয়েটাকেও তার হাতে দিয়া নিস্তার পান না। একটু চলিলেই তাহারা দেখিলেন সাম্‌নে এক বেশ সুন্দর দেবমন্দির,—সকলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সেই মন্দিরে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই তাঁহারা ভারি খুসী। সেখানে তাঁহারা দেখিলেন জীর্ণ শীর্ণ একটা লোক,—সন্ন্যাসীর বেশ,—'আজ-মরে তো-কাল-মরে।' মন্ত্রীরা সেই সন্ন্যাসীটার হাতে রাজকুমারীকে দিয়া আহ্লাদে রাজধানীতে চলিলেন, তাঁহাদের নিস্তার হইল। রাজকুমারী নিজ কর্ম্মের ফল মানেন, তিনি কোন দুঃখ না করিয়া সেই সন্ন্যাসীর নিকটে রহিলেন, 'স্বামীই পরম দেবতা' জ্ঞানে সেই রুগ্ন মুমূর্ষু সন্ন্যাসীর সেবা করিতে লাগিলেন। এই সন্ন্যাসী কিন্তু যে-সে সন্ন্যাসী নন্! যে রাজকুমারের পেটে শাপ প্রবেশ করিয়াছিল,—এই সেই রাজকুমার, জীবনে হতাশ হইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া এই দেবমন্দিরে আছেন। রাজকুমারী তো জানেন না যে এই সন্ন্যাসীও রাজকুমার,—তিনি কিন্তু সুখ দুঃখ কর্ম্মের ফল স্থির করিয়া মনের সুখে স্বামীর কাছে রহিলেন!

দুই জনেই দেবালয়ে থাকেন। রাজকুমারী সংসারের সব কাজ কর্ম্ম করেন, রাঁধেন-বাড়েন, স্বামীকে খাওয়ান-দাওয়ান। রাজপুত্রও রাজকুমারীর পরিচর্য্যায় বেশ সুখী।

এক দিন হইল এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। রাজকুমারী রাজপুত্রের পদসেবা করিতেছিলেন। শীঘ্রই রাজপুত্র ঘুমাইয়া পাড়লেন।

সংসারের কাজ তো করিতেই হইবে, রাজকুমারী এই অবসরে প্রথমেই পুকুর হইতে জল আনিতে গেলেন। তিনি ঘাটে দেরী করিলেন না, তাড়াতাড়ি জল লইয়া মন্দিরে ফিরিলেন। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তো তিনি একেবারে অবাক! তাঁর মুখে আর কথা নাই, তাঁর পা আর চলে না। কাঁকের কলসী মাটিতে রাখিয়া একবারে স্তম্ভিত। রাজকুমারী যে অবস্থায় স্বামীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেই অবস্থায়ই নিদ্রিত, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়া একটা কালো সাপ বাহির হইয়া রহিয়াছে! সাপটা হেলিয়া দুলিয়া বায়ু সেবন করিতেছে। রাজকুমারী এই কাণ্ডটা দেখিয়া অবাক তো হইলেনই, কিন্তু ভীত হইলেন না। তাঁহার বিষয়টা কি জানিতে আগ্রহ হইল। তিনি দেবমন্দিরের নিকটে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন, আর দেখিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি হয়।

রাজকুমারী উদ্বেগে ও আগ্রহে একটু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার চক্ষু দেবালয়ের এক কোণে পড়িল,—তিনি আরো অবাক হইলেন। তিনি দেখিলেন দেবালয়ের সেই কোণ হইতে আর একটা সাপ বাহির হইয়াছে,—সে ও হেলিয়া দুলিয়া বায়ু সেবন করিতেছে। দুই সাপেরই দেখা হইল,—দুইয়েই রাগে জ্বলিয়া উঠিল,—তাদের কি গর্জ্জন, কি ফোস্ ফোস্ শব্দ,—মন্দির যেন ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল। সাপ দুটোর কাণ্ড দেখিয়া রাজকুমারী বড়ই ভীতা

হইলেন, কিন্তু শেষটা কি হয়, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মন্দিরের সাপটা রাজপুত্রের মুখের সাপটাকে কহিল, "আরে তুই তো বড় পাজি, যে তুই এমন রাজপুত্রের পেটে যাইয়া তাঁর সর্ব্বনাশ করিলি, তাঁকে একবারে চিররোগী করিলি! আহা, এমন সুন্দর মুখ, তোর জন্য কি হইয়াছে দেখ্ তো!"

রাজকুমারের মুখের সাপ এই কথা শুনিয়া আরো রাগিয়া গেল,—সে ফণা মেলিয়া কহিল, "আরে তুইও কি কম পাজি? তুই কি জন্য এই মন্দিরে থাকিস্? এই কোণে তুই পিঁপে টাকা মোহর, হীরা জহরত আছে, তোর জন্যই তা' কারো ভোগে আসে না।"

সাপ দুইটার মধ্যে এই রকমের অনেক কথাবার্ত্তা হইল, অনেক ঝগড়াঝাটি হইল, অনেক গালিমন্দ হইল। মুখের সাপটা রাগিয়া শেষে কহিল, "আরে তুই জোর দেখাস্ কি? এখনই তোর অহঙ্কার ভাঙ্গিতে পারি। গরম তৈল গর্ত্তে ঢালি-লেই যে তুই মারা যাস্।"

মন্দিরের সাপটা উত্তর করিল, "তোর মৃত্যুর ঔষধ কি আর আমি জানি না? এই যে সাম্‌নের গাছ, তার পাতার রস খাওয়াইলেই তো তুই মারা যাস্। আর বেশী জাঁক করিতে হইবে না, যা যা।"

ঝগড়া থামিল, সাপ দুটো আপন আপন জায়গায় চলিয়া

গেল। রাজকুমারী আড়াল হইতে সবই শুনিলেন। তাঁর ভয় দূরে গেল, তিনি এখন যেন একটু আনন্দিত হইলেন। তিনি দুটো সাপকেই মারিতে ঔষধ তৈয়ার করিলেন। ঔষধ দেওয়া হইল,—অমনি রাজকুমারের পেটের সাপ মরিয়া গেল। রাজ-কুমার এখন একেবারে সুস্থ হইলেন। ক্রমে তিনি আগের মত বলবান হইলেন। এই আরোগ্যে রাজকুমার রাজকুমারীর যে কত আনন্দ হইল তা' আর বলিবার নয়—খুব আনন্দ, খুব সুখ!

রাজকুমারী মন্দিরের সাপটাকেও গরম তৈল ঢালিয়া মারিয়া ফেলিলেন। মন্দির খুঁড়িয়া রাজকুমার ও রাজকুমারী বিস্তর অর্থ পাইলেন। স্বামী স্ত্রীর এখন বড় সুখ—কোন কিছুর অভাব নাই। আবার তাঁহারা রাজা রাণী হইলেন। বিপুল অর্থ লইয়া রাজকুমারী পিতার রাজ্যে গেলেন। রাজা মেয়েকে এই অবস্থায় দেখিয়া অবাক হইলেন। যখন সব কথা শুনিলেন, তখন খুব খুসীও হইলেন। রাজকুমারীর বড় আদর হইল, অবশেষে সকলে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

* * *

প্রথম গল্পারম্ভ।

গল্পটা শেষ হইল। পেঁচার রাজা ঠিক করিলেন বৃদ্ধ স্থিরজীবীকে রক্ষাই করিতে হইবে। তখন রক্তাক্ষ মন্ত্রীদিগকে

কহিলেন, "ভাই, তোমরা করিলে কি ? তোমরা যে সর্ব্বনাশ করিলে। আর কি রাজার ও আমাদের রক্ষা আছে ? সকলেরই মরণ যে ডাকিয়া আনিলে। শাস্ত্রে এই বলে, 'যেখানে যোগ্য ব্যক্তির অবমাননা ও অযোগ্যের সম্মান হয়, সেখানে বিপদ ঘটিবেই। যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপকার করিবে বুঝা যায়, তাকে ক্ষমা করা বড় মূর্খতা।' যা'হউক, তোমাদের যেমন পরামর্শ, তাতে সবংশে তো মরিবই, কারো আর রক্ষা নাই।"

রক্তাক্ষের কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না। সকল পেঁচা একত্র হইয়া স্থিরজীবীকে আপনাদের দুর্গের মধ্যে লইয়া চলিল। বৃদ্ধমন্ত্রী বড় চতুর, তিনি কাতর হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি তো গেছিই, আমাকে লইয়া যাইবার দরকার কি ? মনে করিয়াছি আগুনে পুড়িয়া মরিব, আগুন জালিয়া দিন, পুড়িয়া মরি। এই কষ্ট আর সহ্য হয় না,—আমার যে কি অবস্থা করিয়াছে—আমিই জানি।"

রক্তাক্ষ খুব বিচক্ষণ মন্ত্রী। তিনি স্থিরজীবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জন্য আগুনে দেহ ত্যাগ করিতে চান ?"

স্থিরজীবী উত্তর করিলেন, "মেঘবর্ণ রাজা কেবল তোমাদের জন্যই তো আমার এই দশা করিয়াছেন। তুমি খুব বিচক্ষণ, তুমিও যখন আমাকে মারিয়া ফেলিবার পক্ষে মত দিয়াছ, তখন এই প্রাণ না রাখিলেই ভাল।"

রক্তাক্ষ কহিলেন, "এই সকলই তোমার ভণ্ডামি। তুমি কি এতই চালাক যে আমার চক্ষে পর্য্যন্ত ধূলি দিতে চাও? দেখ, নিজের জাতিকে কে কবে ছাড়িতে পারিয়াছে? কেহই যে ছাড়িতে পারে না, এই বিষয়ে এক গল্প আছে, শোন" :—

শাখা গল্প ১০—

এক মেয়ে ইঁদুরের উপাখ্যান।

এক সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি বাস করিতেন গঙ্গাতীরে,—এক তপোবনে। এক দিন তিনি গঙ্গা-স্নান করিয়াছেন, তর্পণ করিবেন। যেমন তিনি দুই হাত যোড় করিয়া তর্পণ করিতেছিলেন, অমনি এক ইঁদুরের ছানা তাঁহার হাতে পড়িল। তিনি উপরে চাহিয়া দেখিলেন, একটা শ্যেন পক্ষীর মুখ হইতে ছানাটি পড়িয়াছে। ঋষি বড় যত্নে বটপাতায় উহাকে রাখিয়া দিলেন—আবার স্নান করিয়া তর্পণ করিতে লাগিলেন। তর্পণ শেষ হইল—তিনি বাড়ী চলিয়া যাইবেন। তখন ইঁদুর ছানার কথা মনে হইল। ঋষির বড় যোগবল, তিনি সেই ইঁদুর ছানাটিকে যোগবলে এক সুন্দরী মেয়ে করিলেন। আশ্রমে আসিয়া ঋষি ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমার যে এক মেয়ে সন্তান হইল। একে খুব যত্নে লালন পালন কর।"

ঋষির আজ্ঞা,—পত্নী খুব যত্নেই তাহাকে পালিতে লাগিলেন। ক্রমে মেয়ের বয়স বার বৎসর হইল। কন্যা বিবাহ-যোগ্যা, ব্রাহ্মণী ঋষিকে একটী উপযুক্ত পাত্র খুঁজিতে বলিলেন।

ঋষি পত্নীর কথায় কহিলেন, "আচ্ছা, শীঘ্রই একটী সৎ পাত্র খুঁজিয়া আনিব।"

কিছুদিন গেল। ঋষি একদিন পত্নীকে কহিলেন, "পাত্রের অভাব নাই। আমার মনের মত পাত্র মেয়ের পশন্দ হইবে কি? আমার মতে সূর্য্যদেব বেশ সৎপাত্র,—কেমন তাঁর তেজ, কেমন তাঁর রং!"

ব্রাহ্মণী কন্যার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা অসম্মতা হইলেন না। ঋষি তখনই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন,— অমনি তিনি ঋষির কাছে হাজির। হাত যোড় করিয়া সূর্য্য কহিলেন, "ভগবন্, আমাকে ডাকিয়াছেন কেন?"

ঋষি কহিলেন, "আমার একটী কন্যা আছে, যদি তিনি আপনাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে চান, আপনি তবে তাঁহার পাণিগ্রহণ করুন।"

ঋষি কন্যাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "সূর্য্যদেব উপস্থিত, যদি তাঁহাকে অভিলাষ কর, এখনই বিবাহ হইবে।"

কুমারী বড় লজ্জা পাইলেন,—কিন্তু বাপের আদরের মেয়ে কি না, প্রাণ খুলিয়া কথা কহেন। তিনি কহিলেন, "বাবা, আমার যেন বড় মন হইতেছে না,—ইঁহার তেজ যে প্রখর,

অসহ্য! আপনি সূর্য্যদেব হইতে আর কোন ভাল বর দেখুন।"

ঋষি আর কি করেন, তিনি সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে তো আপনাকে বিবাহ করিবে না, আপনা হইতেও যোগ্যতর পাত্র চাই। আপনি কোন যোগ্যতর পাত্রের কথা বলিতে পারেন কি?"

সূর্য্যদেব কহিলেন, "আমা হইতে যোগ্যতর পাত্র মেঘ। মেঘ আমাকে যখন তখন ঢাকিয়া ফেলে, আমার তখন কোন তেজ থাকে না। সেই যোগ্যতর পাত্র।" এই বলিয়া সূর্য্যদেব প্রস্থান করিলেন।

ঋষি তখনই মেঘকে ডাকিলেন। মেঘ তো অমনি হাজির। ঋষি কন্যাকে বলিলেন, "বাছা, এবার সূর্য্য হইতেও যোগ্যতর বর আনিয়াছি। এখন তোমার ইচ্ছা।"

কন্যা এবারও খুব সঙ্কোচ বোধ করিলেন, ইহার অর্থ পশন্দ হয় না। তিনি ঋষিকে কহিলেন, "না, বাবা, এ জানি কেমন কেমন। দেখিতে বিশ্রী—কালো, আর এর যে প্রাণ নাই, জড়! এ-কে কি বিয়ে করিতে হয়?"

ঋষি বড় মুস্কিলেই পড়িলেন। মেয়ের পশন্দ হয় না, তিনি আর কি করেন? অগত্যা মেঘকে অন্য যোগ্যতর পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মেঘ সরল, সে কহিল,—"বায়ু আমা হইতে যোগ্যতর পাত্র,—বায়ু আমাকে যখন তখন তাড়াইয়া দেয়,

—তার জন্য স্থির থাকিতে পারি না। আপনি একবার তার সন্ধান দেখুন।" মেঘ চলিয়া গেল।

ঋষির কি আর দেরী হয়? তিনি বায়ুকে তখনই ডাকাইলেন। বায়ু আসিল। ঋষি কন্যাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "এবার বায়ু আসিয়াছে, দেখ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, ইহাকে বিবাহ করিতে পার।"

কন্যাও নাছোড়বান্দা, তিনি কহিলেন, "বলেন কি, বাবা? এও যে বড় চঞ্চল, একবারেই স্থির থাকিতে পারে না। যে সর্ব্বদা দৌড়ধাপ দেয়, তাকে লইয়া কি ঘরসংসার করা যায়?"

ঋষি কি করেন, বায়ুকে অন্য যোগ্যতর বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বায়ু কহিল, "আমি চঞ্চল, কিন্তু আমি পর্ব্বতের কাছে বড় জব্দ,—তার কাছে গেলেই সে আমাকে আটকাইয়া রাখে, আমি একবারে নষ্ট হই।" বায়ু এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেল।

ঋষি এবার পর্ব্বতকে ডাকাইলেন। পর্ব্বত আসিল। কন্যাকে ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বর পশন্দ হইলে ইহাকে বিবাহ করিতে পার।" কন্যাও কম পাত্র নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "এ যে, বাবা, বিরাট মূর্ত্তি,—দেখিলে ভয় হয়! ইহার গা, হাত পা কেমন পাথরের মত কঠিন। আর কেমন ভারি ভারি দেখিতেছেন না? আমি একে চাই না।"

ঋষি আর কি করেন, অগত্যা পর্ব্বতকে অন্য যোগ্যতর

বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পর্ব্বত কহিল, "আমা অপেক্ষা যোগ্যতর তো ইঁদুর। সে আমাকে যখন তখন কাটিয়া খানখান করে। কখনো বা একবারে ধসাইয়া দেয়।" এই বলিয়া পর্ব্বতও চলিয়া গেলেন।

ঋষির আর অপেক্ষা নাই, তখনই ইঁদুরের ডাক পড়িল। কন্যাকে ডাকিয়া ঋষি কহিলেন, "তোমার মত হইলে ইহাকে বিবাহ করিতে পার।"

কন্যার তো আনন্দের সীমা নাই। তিনি বড় আনন্দে কহিলেন, "হাঁ, বাবা, এর হাতেই আমাকে দান করুন। আমি যা' ছিলাম, আমাকে তা'ই করিয়া দিন। স্বজাতীয়ের হাতে পড়িলে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসারী করিতে পারিব।"

তাহাই হইল। ঋষি কন্যাকে ইঁদুর করিয়া সেই ইঁদুরের সঙ্গেই বিবাহ দিলেন। দুইজনেই খুব সুখী হইল।

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ।—

গল্পটি শেষ করিয়া রক্তাক্ষ কহিলেন, "দেখ, যত কেন কিছু না বল, স্বজাতিকে ছাড়িয়া যাওয়া বড় শক্ত,—কেউ পারে না। তুমি এখন আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য ভণ্ড সাজিয়াছ, কিন্তু তোমার মন স্বজাতির দিকে। ইহা বুঝিয়াও আমি তোমাকে কি প্রকারে প্রাণে রক্ষা করিতে পারি? রাজা তোমার পক্ষ,

তিনি তোমাকে আশ্রয় দিবেনই।—তাঁহার যে সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা নিশ্চয়।”

রক্তাক্ষের কথা কেউ গ্রাহ্য করিল না। সকলে ধরাধরি করিয়া স্থিরজীবীকে দুর্গে লইয়া চলিল। তাহারা যখন চলিতে লাগিল, তখন স্থিরজীবী ভাবিলেন, “রক্তাক্ষ বেটা বড় চালাক, রাজনীতিতে পণ্ডিত। তা' না হইলে কি আমাকে মারিতে বলিতে পারে? আহা, রাজা কি বোকা, ইঁহার পরামর্শমতে কাজ করিলে কাহারো কিছু অনিষ্ট হইত না।”

সকলে তো স্থিরজীবীকে লইয়া দুর্গের দ্বারে গেল। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “ইহাদের বধের তো উপায় দেখিতে হইবে,—যদি দুর্গের ভিতরে যাই, তবে আমার আকার, প্রকার, বা ইঙ্গিত দেখিয়া ইহারা চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিবে। দুর্গের দ্বারে নির্জ্জনে থাকিলেই আমার ভাল।”

স্থিরজীবী রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ, আমার যে অবস্থা আমাকে দুর্গমধ্যে লইয়া না গেলেই ভাল হয়,—আমার কখন কি হয় ঠিক তো নাই। আর বিশেষ আমি অপরিচিত, আপনার বিপক্ষের স্বজাতি, আমাকে হঠাৎ দুর্গমধ্যে না নেওয়াই উচিত। আমি আপনার হিতৈষী সন্দেহ নাই, কিন্তু নীতিশাস্ত্রে বলে, নিতান্ত অনুরক্ত বা শুদ্ধচরিত্র হইলেও কাহাকে প্রথম প্রথম নিজ বাড়ীতে রাখিতে নাই। আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। আমাকে দুর্গের দুয়ারেই রাখুন, আমি এখানেই

সুখে থাকিতে পারিব। এখানে থাকিলেই আপনার চরণ দর্শন পাইয়া সুখী হইব।”

পেঁচার রাজা বুঝিলেন সহজ। তিনি কহিলেন, “আচ্ছা বেশ, তুমি দুর্গের দুয়ারেই থাক।” তিনি বৃদ্ধের জন্য ভাল ভাল আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধমন্ত্রীর এখন মহাসুখ।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্থিরজীবী বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইলেন, বেশ চলাফেরা করিতে পারেন। ইহা দেখিলেন দূরদর্শী মন্ত্রী রক্তাক্ষ। তিনি তখন রাজা ও অন্যান্য পেঁচাকে কহিলেন, “এখানে সকলকেই সমান মূর্খ দেখিতেছি। তোমাদের মূর্খতা দেখিয়া আমার একটা গল্প মনে পড়িল, গল্পটি এই :—

শাখা গল্প ১১—

সোণার বিষ্ঠাত্যাগী পাখীর উপাখ্যান।

এক পর্ব্বতে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছের কোটরে একটা পাখী থাকিত—নাম সিন্ধুক। সে বড় আশ্চর্য্য পাখী, সে সোণা হাগিত। এক দিন এক ব্যাধ জাল দড়ি লইয়া সেই গাছের কাছে আসিল। পাখীটা তখন সেই গাছের ডালে বসিয়াছিল। চুপ করিয়া ব্যাধটা যেই গাছের নীচে আসিল, অমনি পাখীটা তার সম্মুখে হাগিয়া ফেলিল।

ব্যাধটা তো অবাক,—পাখীটা হাগিল, আর সোণা হইয়া গেল ! ব্যাধ কি আর লোভ সাম্‌লাইতে পারে? সে তখনই তাহার জাল পাতিল। তাহাতে নানা প্রকারের খাদ্য দিল। পাখীটা বড় লোভী, সহজেই ব্যাধের জালে বদ্ধ হইল। ব্যাধ তাহাকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিল। মনে তার ভারি আনন্দ।

খাঁচায় পুরিয়া বাড়ী চলিল,—কিন্তু তাহার মনে বড় ভয় হইল, পাছে রাজা একথা জানিতে পারেন। রাজা জানিলে কি আর মাথা থাকিবে? ব্যাধ সেই পাখী লইয়া রাজবাড়ী গেল। সে রাজার পায়ে পাখী রাখিয়া তাহার আশ্চর্য্য গুণের কথা কহিল! রাজা বড় খুসী হইলেন, তিনি পাখী রাখিয়া তাহার যত্নের জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মন্ত্রীর কিন্তু ইহা অসহ্য হইল। তিনি রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, আপনিও যেমন, একটা বেদের কথা বিশ্বাস করেন। একটা পাখী,—সে সোণা হাগে, এওকি একটা কথা? খামখা পাখীটাকে লইয়া খরচান্ত হইবেন কেন? ওটাকে এখনই ছাড়িয়া দিন্। ওটাকে রাখিলে লাভ হইবে এই—হেগে মুতে বাড়ীটাকে নষ্ট করিবে।"

রাজা মন্ত্রীর কথাই শুনিলেন। তিনি পাখীটাকে খাঁচা হইতে ছাড়িয়া দিলেন। পাখীটা উড়িয়া রাজার সিংহদ্বারে বসিল। —অনেক লোক জড় হইয়াছে, সেই সময়ে পাখীটা আর একবার হাগিল। সকলে বড়ই অবাক হইল, যে পাখীটা

সোণা হাগিয়াছে। পাখীটা কিন্তু হাসিয়া কহিল, "আমি বুঝিয়াছিলাম, সংসারে বোধ হয় আমিই বোকা, যে আমি বেদের কাছে সোণা হাগিয়াছিলাম। এখন দেখি যে সংসারে অনেকেই আমার মত বোকা,—রাজা বোকা, মন্ত্রী বোকা, ব্যাধ-ব্যাটা বোকা !"

এই বলিয়া তো পাখী উড়িয়া গেল। তখন রাজা, মন্ত্রী ও আর আর সকলের জ্ঞান আসিল। তাঁহারা নিজেদের বোকামীর জন্য তখন বিস্তর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।"

* * * *

প্রধান গল্পারম্ভ—

পেঁচার রাজার অন্যান্য মন্ত্রীরা রক্তাক্ষের কথা রাখিলেন না। তাঁহারা স্থিরজীবীকে খুব সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রক্তাক্ষ বুঝিলেন বড় বিপদ। তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁহারা ছিলেন, সকলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন—

"আমাদের রাজার যতদূর ভাল হইবার হইয়াছে,—আর হইবে না। যথাসাধ্য আমি সৎ পরামর্শই দিয়াছিলাম, তিনি তাহা কাণে লইলেন না। তিনি এখন যা-ইচ্ছা তাই করুন, আর আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিয়া যে রাজার বিপদ দেখিব, তাহা পারিব না। অতএব চল আমরা অন্য কোন পাহাড় পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লই। বিপদ তো হইবেই, তা সংঘটনের পূর্ব্বেই প্রতীকারের চেষ্টা দেখা উচিত।"

এই বিষয়ে একটা গল্প আছে, কহিতেছি, শোন :—

শাখাগল্প ১২—

খরনখর সিংহ ও দধিপুচ্ছ শৃগালের উপাখ্যান।

"এক যে ছিল বন, তাতে এক সিংহ বাস করিত—তার নাম 'খরনখর'। সে ভারি মস্ত সিংহ,—সেই বনের রাজা। সে জন্তু দেখিলেই শিকার করিয়া খায়। এক দিন সমস্ত দিন ঘুরিল, শিকার আর পাইল না। পেটে বড় ক্ষুধা,—কি করিবে সিংহটা কিছু ঠিক করিতে পারিল না। সমস্ত দিন গেল,—যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সে এক পর্ব্বতের গুহার কাছে আসিল। সে মনে করিল "এই গুহায় অবশ্যই কোন জন্তু থাকে, সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে, জন্তুটা শিকার করিয়া অবশ্যই গুহায় ফিরিবে। আমি লুকাইয়া থাকি, যেই সে গুহার ভিতরে আসিবে, অমনি তাহাকে খাইয়া ক্ষুধা মিটাইব।" সিংহের তো আশায় ভারি আহ্লাদ, সে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

এই গুহায় এক শেয়াল বাস করিত,—তার নাম দধিপুচ্ছ। সে দিনের বেলায় শিকারে বাহির হইয়াছিল, সন্ধ্যা দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল। শেয়াল গুহায় প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি সে দেখিল, সিংহের পায়ের চিহ্ন! তাহা কেবল যাইবারই চিহ্ন, ফিরিয়া আসিবার চিহ্ন নহে।

শৃগালের বড় ভয় হইল,—সে কি আর গুহায় প্রবেশ করিতে পারে? সে মনে মনে ঈশ্বরের নাম করিয়া কহিল, "বাবা, যদি গুহার মধ্যে যাইতাম, তবে কি সর্ব্বনাশই হইত! এখনই যে প্রাণটা হারাইতাম! সিংহ তো এই গুহায় আছে, এখনও বাহির হয় নাই। আছে কি না আছে, তা বুঝিবারও তো কোন উপায় দেখি না।"

শেয়াল বড় ভাবনায় পড়িল। কিন্তু শেয়াল জাতি বড় দুষ্ট, বড় চতুর, হঠাৎ-বুদ্ধিও তার কম নয়। সে এক ফন্দি আঁটিল। সে গুহার মুখে যাইয়া ডাকিল, "ওহে গুহা ভাই, ওহে গুহা ভাই।" গুহার উত্তর নাই। শেয়াল আবার ডাকিল, "গুহা ভাই, আজ আমার কথায় জবাব দেওনা কেন? তোমার প্রতিজ্ঞা ছিল, ডাকিলে উত্তর করিবে। তুমি উত্তর করিলে না, তবে আমি যাই—অন্য গুহায়ই যাই। আমার কথা রহিল, তুমি না ডাকিলে আমি আর ফিরিব না।"

সিংহ মনে করিল গুহার সহিত শেয়ালের বোধ হয় কথা-বার্ত্তা হয়। আজ সে সেখানে, তাই কথা বন্ধ। সিংহ ঠিক করিল সে নিজেই শেয়ালকে ডাকিবে। শেয়াল যেমন গুহায় যাইবে, অমনি তাহাকে ধরিয়া খাইবে।

সিংহের বড় আশা কি না, সে শেয়ালকে ডাকিল। সিংহের ডাক,—ভয়ানক ডাক, গুহাসুদ্ধ পর্ব্বত যেন কাঁপিয়া উঠিল। দূরে যে সকল জীব জন্তু ছিল, তাহারা প্রাণের ভয়ে দূরে পলাইল।

শৃগাল ডাক শুনিয়া বুঝিল সিংহ গুহায় আছে। সেও প্রাণে ভীত হইল। পলাইবার সময় এই মাত্র কহিল, "যে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া না চলে, সেই বিপদে পড়ে।"

* * * *

প্রধান গল্পারম্ভ—

গল্পটি শেষ হইল। মন্ত্রী রক্তাক্ষ আর দেশে রহিলেন না। তিনি সমস্ত পরিবার ও আত্মীয় স্বজন লইয়া অন্য কোন দেশে চলিয়া গেলেন।

রক্তাক্ষ চলিয়া গেলে স্থিরজীবীর ভারি আনন্দ হইল। তিনি মনে করিলেন, "যা' হউক, মহাশত্রু চলিয়া গেল! বাঁচিলাম, বাবা! সে থাকিলে আর উপায় ছিল না, আমার ভণ্ডামি এখনই ধরা পড়িত। সে গিয়াছে, এখন আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর সব মন্ত্রীরাতো বোকা, মূর্খ।"

স্থিরজীবী এখন তো নিরাপদ। তিনি পেঁচাদের দুর্গে যাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে পারেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি রোজ রোজ নিজের বাসায় এক একখানি কাঠ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পেঁচাগুলি বড় বোকা, ইহার অর্থ তাদের কেউ বুঝিতে পারিল না।

অনেক কাঠ যোগাড় হইল। স্থিরজীবী আগুন ধরাইয়া দিবার ফন্দিটা খুঁজিতে লাগিলেন। এক দিন ভোর হইল।

দিনের আলোতে পেঁচারা চোখে দেখে না, এই সুবিধায় স্থিরজীবী কাকের রাজা মেঘবর্ণের নিকট উড়িয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া কহিলেন,

"মহারাজ, শত্রুর দুর্গে আগুন ধরাইয়া দিবার সব প্রস্তুত। ফটকেই বিস্তর কাঠ সাজাইয়া রাখিয়াছি। আপনারা সকলে এক এক খানি জ্বলন্ত কাঠ লইয়া যাইয়া তাহাতে ফেলিয়া দিয়া আসুন। এখন আগুন ধরাইয়া দিলেই শত্রু সবংশে নির্ব্বংশ হইবে।"

স্থিরজীবীর কথা শুনিয়া রাজাতো ভারি খুসী। তিনি বুড়ো মন্ত্রীর নিকট সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রথমে কি করিলেন, শেষে কি হইল ইত্যাদি।

বৃদ্ধমন্ত্রী কহিলেন, "ও সব কথা পরে হইবে, এখন যাহা করিতে বলিতেছি, তাহা কর। বিপক্ষের চর যদি জানিতে পারে আমি এখানে আসিয়াছি, তবে পেঁচাগুলি এখনই উড়িয়া পলাইয়া যাইবে।"

রাজার আজ্ঞা হইল,—সকল কাকই এক এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ মুখে লইয়া স্থিরজীবীর সহিত উড়িয়া চলিল। শীঘ্রই তাহারা শত্রুর দুর্গের দুয়ারে যাইয়া সাজান কাঠের উপর আগুন ফেলিয়া দিল। কাঠগুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনে পেঁচারা পুড়িয়া মরিতে লাগিল। তখন রক্তাক্ষের উপদেশ সকলের মনে পড়িল। তাহারা তখন কতই শোক

করিতে লাগিল। পেঁচারা সেই আগুনে সবংশে নির্ব্বংশ হইল।

শত্রু নাশ করিয়া কাকের রাজা সেই বটগাছে ফিরিয়া আসিলেন। সকলের মহা আনন্দ। রাজা স্থিরজীবীর নিকট আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত শুনিলেন। বুড়ো মন্ত্রীর কষ্টের জন্য রাজা অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। স্থিরজীবী কহিলেন, "কষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু অন্য উপায় যে আর ছিল না। ততদূর দুঃসাহস না করিলে কার্য্যসিদ্ধিও হইত না। দুঃখ কষ্টের ভয় করিলে কি কোন কঠিন কাজ হয়? শাস্ত্রে আছে, "যে কাজ করিতে হইবে, তাহা করিতে যাইয়া দুঃখ কষ্ট সবই সহিতে হয়, তাহাতে অপমান নাই।" এই বিষয়েরও এক গল্প আছে, বলিতেছি :—

* * *

শাখা গল্প ১৩—

মন্দবিষ সাপ ও জালপাদ ব্যাঙের উপাখ্যান।

এক যে ছিল সাপ, তার নাম মন্দবিষ। সে কেবল সুখই ভালবাসিত, সুখেই কাল কাটাইতে চাহিত। কোন কষ্ট না হয়, পরিশ্রম করিতে না হয়, এমন ভাবে চলিতে পারিলেই সে সুখী হইত। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট সংসারের বড় কষ্ট। তা' যার

আছে, সে আর কিছুতে সুখী নয়। সাপটা কিন্তু খুঁজিত কেবল প্রচুর খাওয়া দাওয়া। এই ভাবিয়া সে তো এক হ্রদে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে মেলাই ব্যাঙ্। সাপের আনন্দ আর ধরে না। প্রথম প্রথম সে কোন লোভ দেখাইল না। ব্যাঙ্গুলি তাহার খাদ্য, তা' পাইয়াও খায় না, ইহাতে তাহারা তো ভারি অবাক্।

একটা বড় ব্যাঙ্ ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া একদিন সাপটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, আপনি আর এখন আহার খোঁজেন না কেন?"

সাপটা চালাক্, সে কহিল, "বাপু, আমার কপাল মন্দ, আমার আহারে রুচি নাই। আজ সন্ধ্যায় আহার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। সম্মুখে দেখিলাম একটা ব্যাঙ্। যেই তাহাকে ধরিতে গেলাম, অমনি সে কতকগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যে যাইয়া কোথায় যে লুকাইল, বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণও যেমন তেমন ব্রাহ্মণ নন্, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। আমার তখন বড় ক্ষুধার জ্বালা, কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি সাম্নে এক ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাহাকেই কামড়াইয়া দিলাম। আমার কামড়, ব্রাহ্মণ তো তখনই মরিলেন। তাঁহার বাপ ইহা জানিলেন। তিনি আমাকে শাপ দিলেন যে, "তুই যেমন আমার ছেলেকে কামড়াইয়া মারিলি, তুই চিরকাল মাথায় ব্যাঙ্ বহিয়া চলিবি। তারা যা খাইতে দিবে, তুই তা খাইয়া বাঁচিবি।" শুনিলে তো আমার উপর কি

সর্পের মাথায় ব্যাঙের রাজার আরোহণ।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ভয়ানক ব্রহ্মশাপ! আমি তাই তোমাদের মাথায় বহিতে আসিয়াছি, এখন তোমাদের যা' ইচ্ছা।"

ব্যাঙেরা সাপের কথা শুনিল। তারা যাইয়া তাদের রাজা জালপাদকে এই সংবাদ জানাইল। রাজার তো মহা আনন্দ, সে তখনই হ্রদ হইতে উঠিয়া সাপটার নিকটে গেল। সাপের ফণা বিস্তৃতই ছিল, সে একছের যাইয়া সেই ফণার উপর উঠিয়া বসিল। সঙ্গে যে সকল ছোট বড় ব্যাঙ ছিল, তাহাদের অনেকে সাপের গায়ে উঠিল। যাহারা উঠিতে পারিল না, তাহারা সাপের পিছনে পিছনে চলিল। সাপ এপাশে ওপাশে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল।

ব্যাঙ্ সাপের মাথায় চড়ে, এযে বড় আশ্চর্য! ব্যাঙের রাজা জালপাদের তো আজ ভারি সুখ! সে আহ্লাদে ডগমগ হইয়া কহিল, 'আহা, তোমার ফণায় চড়িয়া কি সুখই পাইলাম! এমন সুখ আর জীবনে পাই নাই।'

পরদিনও জালপাদ আবার সাপের ফণায় চড়িল। সাপ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। জালপাদ কহিল, "ওহে মন্দবিষ, আজ তোমার কি হইল, চলিতে পার না যে?"

মন্দবিষ চালাক্, সে কহিল, "আজ কিছু খাই নাই, শক্তি কোথায় পাইব যে তোমায় লইয়া চলিব?'

ব্যাঙের রাজা কহিল, "কেন, যদি ক্ষুধা পাইয়া থাকে, এইতো মেলাই ব্যাঙ্ আছে, ধরিয়া খাও না।"

মন্দবিষ বড় সুখী হইয়া কহিল, "আমার এই ব্রহ্মশাপ আছে, খাইতে না বলিলে খাইব না। তোমার দয়ায় সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলাম।" মন্দবিষের মহা সুযোগ, সে ব্যাঙ্গুলি ধরিয়া খাইতে লাগিল।

কিছু দিন এইরূপে কাটিল। সাপটার বড় সুবিধা, সে রোজ রোজ ব্যাঙ্ ধরে, আর খায়। খাইয়া খাইয়া সাপটা বেশ মোটাসোটা হইল। তার বড় আশা, বড় আনন্দ,—সে ভাবিল ব্যাঙ্গুলি শীঘ্র শীঘ্র উজাড় না হইলেই ভাল।

ব্যাঙের রাজা বোকার যে হদ্দ। সে ইহার অর্থ কিছুই বুঝিল না। একদিন মন্দবিষতো ব্যাঙ্দের মাথায় করিয়া চলিয়াছে। আর একটা সাপ সে দিন কোথা হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সে মন্দবিষকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে ব্যাপার কি? এ যে বড় অবাক্ কাণ্ড! আমরা ব্যাঙের শত্রু, ধরিতে পারিলেই তাদের খাইয়া ফেলি। আর তুমি উহাদের মাথায় আর পিঠে চড়াইয়া চলিয়াছ যে?'

মন্দবিষ একটু হাসিয়া কহিল, "ইহাও তুমি বুঝিলে না? তুমিও যে বেহদ্দ বোকা! আমাদের সম্বন্ধ কি, আমি কি তা ভুলিয়া গিয়াছি? এত যে করিতেছি, তার কারণ আছে। কয়েকটা দিন পরে কারণটা বেশ বুঝিতে পারিবে। তোমার কথা শুনিয়া আমার একটা গল্প মনে পড়িল। গল্পটি এই:—

শাখা গল্প ১৪—

দুষ্টা ব্রাহ্মণীর গল্প।

এক গ্রামে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম যজ্ঞদত্ত। ব্রাহ্মণটি বড় সাদাসিদে, বেশ নিষ্ঠাবান্, সংসারের কোন গোলমালে তিনি যাইতেন না। তাঁর যে ব্রাহ্মণী—তিনি ছিলেন বড় চট্‌পটে, বড় চতুর। অনেক সময়ে তিনি বেশী বেশী কথা কহিতেন। সুন্দরীও ছিলেন তিনি খুব। ব্রাহ্মণ নিজে পড়া শোনা করিতেন, আর সংসারের কাজ কর্ম্ম এক আধটুকু দেখিতেন, অন্য দিকে তাঁর তেমন মন ছিল না। ব্রাহ্মণী সংসারের কাজ করিতেন, পূজা-আহ্নিকও করিতেন। তাঁর আর একটা রোগও ছিল, তিনি রোজই নানা মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু ইহার কিছুই জানিতেন না। পাড়ায় রাষ্ট্র ছিল, ব্রাহ্মণীর স্বভাব বড় ভাল ছিল না।

কথায় আছে চোরের দশ দিন, সাধুর একাদন। এক দিন ব্রাহ্মণী তো বেশ ভাল ভাল মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া রাত্রিতে লইয়া চলিয়াছেন।—কিছু দূর গেলেই দেখিলেন সম্মুখে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তো অবাক্। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি গো ? এ সকল কি ? কার জন্য এই মিষ্টান্ন লইয়া চলিয়াছ ? আমার মনে কিন্তু সন্দেহ হয়।"

ব্রাহ্মণী তো কম চালাক্ নন্, তিনি উত্তর করিলেন, 'বা, তোমার সন্দেহ তো বেশ! তুমি পূজা-আচ্চা করিতেও সন্দেহ দেখ যে! জানতো আমি কাত্যায়নীর ব্রত লইয়াছি? সেইজন্য দিনে কিছু খাই না, রাত্রিতে এই গ্রামের কাত্যায়নীর মন্দিরে যাই, সেখানে পূজা-আচ্চা করিয়া তবে খাই। মনে লজ্জা হইত, তাই এতদিন একথা তোমায় বলি নাই। যখন দেখিলেই, তখন সব কথা খুলিয়া বলিলাম।"

ব্রাহ্মণ অতি সরল, তিনি নিজ স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিলেন, বেশী কিছু আর তাঁহাকে বলিলেন না। ব্রাহ্মণ বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণীও সাজান থালা লইয়া হাসিতে হাসিতে নিজের উদ্দেশ্যে চলিলেন।

ব্রাহ্মণীর সাহস বাড়িল। তিনি রোজই নানা রকমের সুখাদ্য খাবার লইয়া স্বামীর নিকট দিয়া বাহির হইয়া যাইতেন, ব্রাহ্মণ বড় বেশী কিছু বলিতেন না।

ব্রাহ্মণীর কিন্তু এই রোগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন আর সময় অসময় রহিল না,—যখন তখন বাড়ীর বাহির হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সরল হইলেও তাঁহার মনে কেমন একটা খটকা আসিয়া পড়িল। আসল কথা জানিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল।

একদিন ব্রাহ্মণের নিকট দিয়াই ব্রাহ্মণী সুখাদ্য দ্রব্যের থালা হাতে লইয়া বাহির হইয়াছেন। ব্রাহ্মণও অন্য এক পথ

ধরিয়া ব্রাহ্মণীর আগেই সেই কাত্যায়নীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণী মন্দিরের সাম্‌নের পুকুরে স্নান করিয়া মন্দিরে আসিতেছেন। কাত্যায়নী-প্রতিমা অতি বৃহৎ। ব্রাহ্মণ সেই প্রতিমার পিছনে লুকাইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণী পূজা সাঙ্গ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "মা, শীঘ্র শীঘ্র আমার স্বামীর চক্ষু অন্ধ কর। এত পূজা দি, আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না, মা ?"

প্রার্থনা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তো অবাক-অপ্রস্তুত। তিনি আর কি বলিবেন, প্রতিমার পিছন হইতে স্বর বদ্‌লাইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, যদি তুমি তাকে এমন সুমিষ্ট খাদ্য রোজ রোজ খাওয়াইতে পার, তবে সে শীঘ্রই অন্ধ হইবে।"

ব্রাহ্মণী বুঝিলেন কাত্যায়নী প্রসন্না হইয়াছেন। তাঁহার আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলেন। ব্রাহ্মণও বাড়ী আসিয়া ব্রাহ্মণীর রকম-সকম দেখিতে লাগিলেন।

এখন রোজ রোজই ব্রাহ্মণী নানা রকমের সুখাদ্য তৈয়ার করেন, আর স্বামীকে খাওয়ান। ব্রাহ্মণ একদিন গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল তুমি এত ভাল ভাল জিনিস খাওয়াও কেন ?—এত খাইলে যে আমার অসুখ হইবে।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তোমাকে এমন জিনিস খাওয়াইব না ত আর কাহাকে খাওয়াইব ? আর আমার কে আছে ?" শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিলেন, কিন্তু মনে মনে বড়ই রাগিয়া গেলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল, ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে খুব খাওয়ান। ব্রাহ্মণও খুব হৃষ্টপুষ্ট হইলেন। একদিন তিনি গৃহিণীকে কহিলেন, "ওগো আমি যে আর চোখে দেখি না, চোখের জ্যোতি যেন কমিয়া আসিতেছে, এ হইল কি?"

ব্রাহ্মণীতো ভারি খুসি। তিনি মনে মনে কহিলেন, "মা, তোর কথাই বুঝি সত্য হইল। সত্য হউক, তোকে আরো ভাল পূজা দিব, মা।"

ব্রাহ্মণীর সাহস বাড়িল। তিনি মনে করিলেন 'স্বামী অন্ধই হইয়াছেন, এখন আর ভয় নাই, এখন যা-ইচ্ছা করিতে পারিব।' বাস্তবিক ব্রাহ্মণী তাহাই আরম্ভ করিলেন, ব্রাহ্মণ আর কিছু বলেন না।

একদিন ব্রাহ্মণের কাছেই ব্রাহ্মণী এক পরপুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস আরম্ভ করিলেন। সে রসিকতা কি আর ফুরায়! ব্রাহ্মণের এসব আর সহ্য হইল না। তিনি দুই জনকেই লাঠি মারিতে মারিতে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন। পৃথিবীর পাপের ভার কমিয়া গেল।

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ—

গল্পটি শেষ করিয়া মন্দবিষ অন্য সাপটাকে কারণ বুঝাইল। সে আবার ব্যাঙ্‌গুলির প্রশংসা আরম্ভ করিল। সেকি প্রশংসা,

যেন স্বর্গে উঠানো। ব্যাঙের রাজা জালপাদ শুনিয়া কহিল, "এ তোমার অন্যায় প্রশংসা—খামখা, অসত্য। তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিন্তু আমার কেমন কেমন বোধ হইতেছে। বোধ হয় তুমি আমাদের সর্ব্বনাশের ফন্দি করিয়াছ।"

মন্দবিষ জিভ্ কাটিয়া কহিল, "ও কি কথা, এমনও কি হয় ?" সে নিজের অভিপ্রায় গোপন করিয়া রহিল। জলপাদও আর কোন অনুসন্ধান করিল না। মন্দবিষের আর ভাবনা কি, সে রোজ রোজ কতকগুলি করিয়া ব্যাঙ্ ধরিয়া খায়। এই রূপে সে সবগুলিকে একে একে খাইয়া ফেলিল।

*　　*　　*

প্রধান গল্পারম্ভ—

স্থিরজীবী এই সব কহিয়া কাকের রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, মন্দবিষ যেমন বুদ্ধি খাটাইয়া সবগুলি ব্যাঙ্‌কে খাইয়া আসিল, আমিও তেমনি সমস্ত শত্রু নষ্ট করিয়া আসিয়াছি। আমার উপর কত বিপদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু কিছু-তেই আমি ভয় পাই নাই। কাজ আরম্ভ করিলে প্রাণপণে শেষের চেষ্টা করিতে হয়। কষ্ট বা বিপদের ভয় করিয়া চলিলে, তাহা দ্বারা কোন কঠিন কাজ হয় না।"

মেঘবর্ণ কহিলেন, "হাঁ, তা ঠিক। প্রকৃত মানুষের কাজই এক আশ্চর্য্য রকমের। হাজার বিপদে পড়ুন, কিছুতেই

তাঁদের পিছনে হটাইতে পারে না, তঁারা সেই কাজ সম্পন্ন করিবেনই। আপনিও তেমনি কত বিপদে পড়িলেন, তবু শত্রু-নাশ না করিয়া ফিরিলেন না!"

স্থিরজীবী কহিলেন, 'মহারাজ, আপনার বড় কপাল-জোর। শাস্ত্রে বলে, 'যাঁর কাজ সুন্দররূপে শেষ হয়, তিনিই ভাগ্যবান্।' আমাকে প্রশংসা করিতেছেন বৃথা। আপনার শৌর্য্য-বীর্য্যেই এই কার্য্য শৃঙ্খলায় শেষ হইয়াছে। আপনার বুদ্ধি না থাকিলে এই কাজ হইত না। যাঁহার বুদ্ধি থাকে, যাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য, সাহস পরাক্রম থাকে, তাঁর জয় নিশ্চয় হয়। আপনার মধ্যে সব আছে, আপনার জয় হইবে না কেন?"

মেঘবর্ণ কহিলেন, "আপনার নীতি জ্ঞানের ফল এত দিনে ফলিল। আপনি কি কৌশলেই শত্রুদিগকে বধ করিলেন!"

স্থিরজীবী কহিলেন, "মহারাজ, এখন রাজ্যে শত্রু নাই, সুখে রাজ্য করুন। রাজা হইয়াছি বলিয়া যথেচ্ছাচারী হইবেন না। ধনৈশ্বর্য্য কেবল কিছুকালের জন্য। ইহা যখন-তখন নষ্ট হইতে পারে। মা লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা,—ইহা মনে রাখিবেন। শাস্ত্র-কারেরা কহেন, "ধন-দৌলত স্বপ্নের দেখা বিষয়ের মত। যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ সুখ, ঘুম ভাঙ্গিলে আর কিছুই নয়।" তাই বলিতেছি ধন দৌলতে মত্ত হইবেন না। ন্যায়ের উপর রাজ্য শাসন করুন, প্রজার হিত করুন, চিরকাল নাম থাকিবে, পুণ্যও অক্ষয় হইবে।"
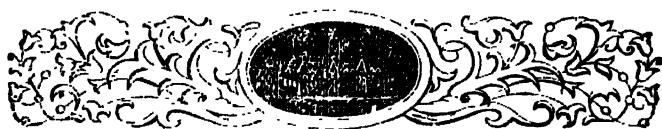
দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাপ্ত-অর্থ নাশ।

বিষ্ণুশর্ম্মা কাক-কোকিলের গল্পটি শেষ করিয়া রাজকুমার-দের কহিলেন, "রাজকুমারগণ, আজ তোমাদের কাছে আর একটি গল্প বলিব। সে বড় সুন্দর গল্প, বড় আশ্চর্য্য গল্প। গল্পটির বিষয়, "যে বোকা, সে-ই হাতের জিনিষ খোয়াইয়া ফেলে। একবার খোয়াইলে আর তাহা লাভ হয় না।" গল্পটি কহিতেছি, শোন :—

প্রধান গল্প—বানর ও কুমীরের উপাখ্যান।

কোন সমুদ্রের তীরে ছিল একটা জামগাছ। গাছটা ছিল খুব প্রকাণ্ড। তা'তে বারমাস ফল ফলিত। সেই ফলগুলি কি সুন্দর, কি মিষ্ট—যেন মধু। লোকে ফলগুলিকে 'অমৃত ফল' বলিত। সেই জামগাছে একটা বানর থাকিত—নাম রক্তমুখ। সে বড় চতুর,—বড় বুদ্ধিমান্। সে সুধু সেই জাম ফল খাইয়াই বাঁচিত।

সমুদ্রের তীর বড় বিস্তৃত, বহুদূর পর্য্যন্ত ধু ধু করে,—তা'তে নির্জ্জন। এক দিন একটা কুমীর সমুদ্র হইতে তীরে উঠিল। সে সেই তীরের বালু-বন ভাঙ্গিয়া জাম গাছটার নীচে যাইয়া বসিল। রক্তমুখ ছিল গাছে,—সে কুমীরকে দেখিয়া কহিল, "আপনি আসিয়াছেন, আমার বড়ই সৌভাগ্য। এ রাজ্যে তো কেউ আসে না, আপনি আসিয়াছেন,—ধন্য হইলাম। অতিথি স্বধু মুখে ফিরিতে নাই, দয়া করিয়া এই ফলগুলি খান।" এই বলিয়া বানর কতকগুলি জাম ফল পাড়িয়া দিল।

কুমীর সেই ফলগুলি খাইল। তাহার মুখে সেগুলি বড়ই ভাল লাগিল। দুই জনের অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের খুব বন্ধুতাই জন্মিল। 'আর একদিন আসিব, আজ যাই' বলিয়া কুমীর সে দিন চলিয়া গেল।

পরদিন সেই সময়ে কুমীরটি আবার আসিল। বানর তাহার সহিত খুব খাতির করিল, কত কি কথা কহিল। সে দিনও সে কুমীরকে অনেক জাম খাওয়াইল। বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে যারপর নাই বন্ধুতাই জন্মিয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল,—রোজ কুমীরটা আসে কত কথাবার্ত্তা তাদের হয়, পরে ফল খাইয়া চলিয়া যায়। এখন এমন হইল কুমীরটাও না আসিয়া পারে না, বানরটাও কুমীরটাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না।

ক্রমেই বন্ধুতা দৃঢ় হইতে লাগিল। কুমীরটা যে ফলগুলি

খাইতে না পারে, তা' সে বাড়ী লইয়া যায়, সেগুলি তার স্ত্রী খায়। বড় মিষ্ট ফল, মকরীর মুখে বড় ভাল লাগিল। সে এক দিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফলগুলিতো বড় মিষ্ট, আপনি এগুলি কোথায় পান্?"

কুমীর সরল ভাবে কহিল, "আমার এক বানর বন্ধু আছে, নাম রক্তমুখ। সেই এই ফলগুলি আমায় দেয়।"

মকরী ভাবিল, "ওঃ, যে রোজ রোজ এমন অমৃত ফল খায়, তার কলিজা না জানি কত মধুর, তা' খাইতে কত সুখ! খাইলে বোধ হয় মরণ হইবে না, যৌবনও যাইবে না।"

ইহা ভাবিয়া মকরী কহিল, "আজ একটা কথা আছে। যে রোজ রোজ তোমায় এই রকমের মিষ্ট ফল দেয়, তাহার কলিজাটা আমায় আনিয়া দিতেই হইবে। যদি আমায় ভালবাস, তবে নিশ্চয়ই আনিয়া দিবে। তা' না হইলে আমি ঠিক মরিব।"

কুমীর তো এই কথা শুনিয়া অবাক! সে বলিল, "আজ তুমি কি কহিতেছ? ওকথা মুখেও আনিও না। সে আমার পরম বন্ধু, ভাইয়ের মত। আরো কথা—সে ফল দেয়, তাহাকে কি এমন কথা কহিতে আছে?"

মকরী তো ছাড়িবার পাত্র নয়। সে জিদ করিয়া কহিল, আমাকে তার কলিজা যে রকমে হউক আনিয়া দিতেই হইবে,— নচেৎ আমি নিশ্চয় মরিব।"

কুমীরের তো বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইল। সে কত হাত

পায়ে ধরিল, কিছুতেই কিছু হইল না। কত রাগ করিল, কত কাঁদিল—স্ত্রীর কথা কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না। মকরী আরো জিদ করিয়া না খাইয়া-না দাইয়া বলিল, "এই বসিলাম, যদি সেই কলিজা আনিয়া দিতে না পার, তবে আমি ভাত জল কিছুই খাইব না, উপুস করিতে করিতে মরিয়া যাইব।"

কুমীরের উভয় সঙ্কট হইল। সে অনেক ভাবিল—অনেক চিন্তা করিল। অবশেষে স্ত্রীর কথাই রাখিবে, ঠিক করিল। সে বুঝিল স্ত্রীলোক জিদ করিলে আর রক্ষা নাই। শাস্ত্রকারেরাই বলেন, "স্ত্রীলোক, মূর্খ, কাঁকড়া ও মাছ ইহারা যা ধরে, তা' না লইয়া আর ছাড়ে না।" স্ত্রীর কথা রাখিতেই হইবে। কি জানি যদি অভিমানে মরিয়া যায়, তবে স্ত্রীহত্যার পাপে পড়িতে হইবে!

কুমীর সে দিনও বানরের নিকট গেল। যাইতে তার একটু দেরী হইল। বানর জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই মকর, তোমার আসিতে আজ এত বিলম্ব হইল কেন? আজ যে দেখিতেছি, তোমার চোখ, মুখ শুক্‌নো। ব্যাপার কি, ভাই?"

কুমীর উত্তর করিল, "হাঁ ভাই, একটু দেরীই হইয়াছে। আজ তোমার বউদিদি আমায় বড় গালাগালি করিয়াছে। সে বলে 'কেবল বন্ধুরটা খাইয়াই আসিতে পার, একদিন তাকে খাওয়াইতেও পার না। উপকার পাইয়া উপকার না করিলে বড় পাপ।' সে আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তোমাকে,

ভাই, আজ আমার বাড়ী যাইতেই হইবে। না গেলে আমার রক্ষা নাই।"

বানর সরল, সে শুনিয়া খুসাই হইল। সে কহিল, "ওতো ঠিক কথা। যাওয়া আসা থাকিলেই খাতির থাকে। কিন্তু, ভাই, আমি যে বানর, গাছে থাকি। জলের মধ্যে যাইব কি করিয়া?"

কুমীর কহিল,—"বাঃ, বেশ কথা! সেই ভাবনায় তোমার দরকার নাই। তুমি আমার পিঠে চড়, আমি দেখিতে দেখিতে তোমাকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাইব। সমুদ্রের মধ্যে কেমন সুন্দর সুন্দর মাঠ, কত গাছ গাছড়া দেখিতে পাইবে। চল, চল, দেরী করিও না।"

বানর কুমীরের কথা বিশ্বাস করিল। সে ভারি খুসী হইয়া কহিল, "তবে আর দেরীর আবশ্যক নাই, এই তোমার পিঠে চড়িতেছি।"

বানর তো কুমীরের পিঠে চড়িল। কুমীর তাকে লইয়া অকুল সমুদ্রের মধ্যে যাইয়া পড়িল। বানরের বড় ভয় হইল। কুমীর যতই জলের নীচে যাইতে লাগিল, বানরের ভয় ততই বাড়িতে লাগিল। বানরের তখন কোন শক্তি নাই, সে একবার কহিল "ভাই, আস্তে চল, আমার যে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, আমার শরীরে যে জোর পাই না।"

কুমীর দেখিল বানর তাহার মুঠোর মধ্যে আসিয়াছে, আর

তার এপাশ ওপাশ হইবার যো নাই। সে তখন তাহার অভিপ্রায় বানরকে জানাইতে কহিল,—"বন্ধু, আজ আমি বড় একটা অপরাধ করিতে চলিয়াছি। স্ত্রীর কথায় তোমাকে বধ করিতে প্রতারণা করিয়া লইয়া যাইতেছি। স্ত্রীর জিদ, কি করিব, বন্ধু? তা না হইলে স্ত্রী-হত্যা হয় যে। এখনও সময় আছে, ইষ্টদেবের নাম কর।"

কুমীরের কথা শুনিয়া বানরের তো আত্মা শুকাইয়া গেল। সে ভয়ে জড়সড় হইয়া কহিল, "ভাই, আমার কি অপরাধ যে তোমরা স্বামী স্ত্রী আমাকে বধ করিবে?"

কুমীর কহিল, "ভাই, আমার কোন দোষ নাই, আমার স্ত্রীর জিদ। সে বলে অমৃতফল খাইয়া তোমার কলিজা নাকি অমৃতের মত বড়ই মিষ্ট হইয়াছে। তা' খাইতে তার বড় সাধ। তাই তোমাকে ফাঁকি দিয়া লইয়া যাইতেছি। স্ত্রীর সহিত এইজন্য খুব বচসা হইয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই জিদ ছাড়িল না, অগত্যা এই পাপের ব্যবস্থাই করিয়াছি।"

বানর বড় চালাক,—বড় বুদ্ধিমান্। সে কহিল, "বাঃ, এই তো কথা? ইহা আমাকে আগে বল নাই কেন? আমার সেই কলিজা যে জাম গাছের কোটরে রাখি, তা' তো আমার সঙ্গে থাকে না! সেখানে এই কথা বলিলেই তো তোমায় সেই কলিজা দিতে পারিতাম। তুমি যে বড়ই ভুল করিয়াছ।

কুমীর বড় সোজা লোক,—এই কথায় সে সুখীই হইল।

সে কহিল, "আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে চল ফিরিয়া যাই। তুমি জামগাছ হইতে সেই কলিজাটা দাও, দুষ্টা সেই কলিজা খাইয়া বাঁচুক। আমিও বন্ধুবধ হইতে রক্ষা পাই। উঃ, কি ঘোর পাপ করিতেই আমি চলিয়াছিলাম!"

কুমীর সমুদ্রতল হইতে বানরকে পিঠে লইয়া আবার জাম-গাছের দিকে চলিল। বানরের বুদ্ধি, সে কুমীরকে কত আশা ভরসা, কত প্রলোভনই দেখাইল। দেখিতে দেখিতে মকর তীরের নিকটে আসিল। বানর এক লাফে তীরে পড়িয়া জামগাছে চড়িয়া বসিল।

বানরের আহ্লাদ তখন দেখে কে! সে এতক্ষণে প্রাণ পাইল। অবিশ্বাসী বন্ধুর উপর বিশ্বাস করিলে কি যে সর্ব্বনাশ হয়, সে ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইল। বানরের মনে তখন নানা ভাবনা, এমন সময়ে কুমীর কহিল, "বন্ধু, আর বিলম্ব কেন? তোমার কলিজা দাও, আমি লইয়া যাই, দুষ্টা তৃপ্ত হউক। তাহা না পাইলে সে এখনই আত্মহত্যা করিবে।"

বানরের এখন সাহস আসিয়াছে, সে কুমীরকে যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া গালাগালি দিতে দিতে কহিল, "আরে বোকা, তোর গলায় দড়ি দিয়া মরা উচিত। তুই বিশ্বাসঘাতক, তুই কৃতঘ্ন, তুই আমার এখান হইতে দূর হ। তোর মত বন্ধুর সহিত মিলিলে মরিতে হয়। আমি আর তোর মুখ দেখিতে চাই না, আরো মনে রাখ্,—একটা লোকের দুটা কলিজা হয় না।"

মকরের মুখে আর কথা নাই : সে তখন 'হায় কি করিলাম' বলিয়া নিজের বোকামীর জন্য মনে মনে কত অনুতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকাশ্যে নানা প্রলোভন দেখাইয়া সে বানরের সহিত আবার মিল করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল।

কুমীর কহিল, "ভাই, তুমি রাগ কর কেন ? আমি যে তামাসা করিতেছিলাম, ইহাও কি তুমি বুঝিলে না ? চল, চল আমার বাড়ী চল। তুমি না গেলে তোমার বউদিদির খাওয়া হইবে না, সে উপুস করিতে করিতে মরিয়া যাইবে।"

বানর কহিল, "আরে দুষ্ট, আর চালাকি খাটিবে না। আমি আর তোর সঙ্গে যাইব না। শাস্ত্রে আছে, "যে ক্ষুধাতুর, তার কথা বিশ্বাস করিতে নাই। বিশ্বাস করিলে মরিতে হয়।" এই বিষয়ে এক গল্প আছে, শোন্ :—

শাখা গল্প ১—

ব্যাঙের রাজা গঙ্গদত্ত ও প্রিয়দর্শন সাপের উপাখ্যান।

"এক জায়গায় একটা কূপ ছিল। কূঁয়োটা বেশ বড়সড়। সেখানে অনেক ব্যাঙ্ বাস করিত। তাদের রাজার নাম গঙ্গদত্ত। রাজা কিন্তু বড় ভাল ছিল না, জ্ঞাতি-কুটুম্ব বা প্রজাদের সহিত তার তেমনি মিল ছিল না। সকলেই তার উপর বড় চটা ছিল। জ্ঞাতিদের তাড়না এমন অধিক হইল যে গঙ্গদত্তকে সেই কূপ

ছাড়িয়া পলাইতে হইল। রাজার রাগ আর থামে না। সে ঠিক করিল, জ্ঞাতিদের সর্ব্বনাশ করিবে। সে মনে মনে নানা ফন্দিও খুঁজিতে লাগিল।

যখন রাজার এমন ফন্দির চিন্তা, তখন সে দেখিল কিছু দূরে একটা কালো সাপ একটা গর্ত্তে চলিয়া যাইতেছে, তার নাম প্রিয়দর্শন। তাকে দেখিয়াই ব্যাঙের রাজার তো ভারি আনন্দ, সে মনে মনে কহিল, "কোন প্রকারে এই সাপটাকে আমাদের কূপের মধ্যে নামাইয়া দিতে পারিলেই হয়, তবেই আমার জ্ঞাতিদের সর্ব্বনাশ হইবে। শত্রু ধ্বংস করিতে হইলে তার শত্রুকে হাত করিতে হয়!"

ব্যাঙের রাজা তখনই সেই গর্ত্তের কাছে গমন করিল। সেখানে যাইয়া ডাকিল, "ভাই প্রিয়দর্শন, একবার বাহিরে এস তো, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন কথা আছে।"

ডাক শুনিয়া সাপ মনে করিল, "কে আমায় ডাকে? স্বরে বুঝিলাম এ তো আমার স্বজাতীয় নয়। এই পৃথিবীতে আমাকে কেউ তো ভালবাসে না। হঠাৎ ঘরের বাহির হওয়াও তো উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে, "অপরিচিতকে হঠাৎ ঘরে আনিতে নাই, তার কাছেও হঠাৎ যাইতে নাই।" যদি সে ব্যাধ হয়, তবে তো সর্ব্বনাশ, এখনই মন্ত্র দিয়া বা ঔষধ দিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। আর যদি শত্রু হয় তবেও সর্ব্বনাশ, এখনই মারিয়া ফেলিবে।"

এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সাপ কহিল, "কে তুমি ? তোমার নাম কি ? তুমি কি জন্য এই সময়ে আমার নিকট আসিয়াছ, বল তো ?"

ব্যাঙ্ উত্তর করিল,—"আমি ব্যাঙের রাজা—নাম গঙ্গদত্ত। তোমার সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছি।"

সর্প শুনিয়া কহিল, "এ ও কি কথা ? আগুনে আর খড়ে কি মিত্রতা হয় ? যে যারে খায়, তাহাদের মধ্যে কি কখনো মিত্রতা হয় ? তুমি মিথ্যুক, আমি বাহিরে যাইব না।"

গঙ্গদত্ত কহিল,—"আমি মিথ্যা বলি না। আপনি আমাদের শত্রু বটেন, কিন্তু বিপদে পড়িয়া আপনার শরণ লইতে আসিয়াছি। শাস্ত্রে আছে, "যদি প্রাণের আশঙ্কা হয়, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তবে শত্রুরও শরণ লইতে পারা যায়।"

সাপ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমার শত্রু ?"

গঙ্গদত্ত উত্তর করিল,—"আবার কে ? আমার জ্ঞাতিরা।"

সাপ জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথায় ? কত জলাশয়ই তো আছে, তার কোন্‌টাতে তুমি বাস কর ?"

ব্যাঙ্ উত্তর করিল,—"ওখানে সাণ-বাঁধা কূপে।"

সাপ কহিল,—"আমাদের তো পা নাই। আমি সে কূপে নামিব কি করিয়া ? আর যদি নামিতেই পারি, তবে কোথায় থাকিব ? থা'ক, ও সব ঝঞ্ঝাটে আমি যাইব না, তুমি চলিয়া যাও। শাস্ত্রে আছে, "যার যেমন শক্তি, তার তেমন কাজে যাওয়া

উচিত।” অসাধ্য কাজ করিতে গেলে লোকে ঠাট্টা করিবে, গায়ে ধূলো দিবে। আমি যাইব না।”

গঙ্গদত্ত দেখিল ভারি বিপদ। সে উত্তর করিল,—“আপনার সে ভাবনায় দরকার কি? আমি তো আছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি সব ঠিক করিয়া দিব। সে কূপে আমার বাড়ী ঘর আছে, আপনি সেখানে থাকিয়া অনায়াসে আমার শত্রু-ধ্বংস করিতে পারিবেন। আপনার আহারের আর কোন কষ্টই হইবে না।”

সাপ ভাবিল, “ব্যাপার তো বেশ। বুড়োও হইয়াছি, আর আহার তালাস করিতেও পারি না। যদি এমন সুবিধা হয় তো ভালই, আর ভাবনা থাকিবে না।” ঠিক হইল—সাপ যাইবে।

গঙ্গদত্ত কহিল,—“ভাই, লইয়া তো যাইব, কিন্তু একটা কথা আছে। আপনি অঙ্গীকার করুন, আপনি আমার পরিবারের কারো নষ্ট করিতে পারিবেন না। আমি যাদের দেখাইয়া দিব, আপনি কেবল তাদেরই নষ্ট করিবেন।”

সাপ কহিল, “এ কথা কি আর বলিতে হয়? ছি, ছি, আমি তা করিব না। কেবল তোমার জ্ঞাতিদেরই নষ্ট করিব।”

সাপ তো আনন্দে গর্ত্ত হইতে বাহির হইল। উভয়ে চলিয়া সেই কূপের নিকট গেল। উভয়েই কূপের মধ্যে নামিল। সাপের হইল মজা, সে রোজ রোজ ব্যাঙ্ ধরিয়া খাইতে লাগিল।

কিছু কাল এইরূপে চলিল। ব্যাঙের বংশ প্রায় শেষ হইল।

সাপ ব্যাঙ্‌টাকে কহিল,"আর তো আহার মিলে না, এখন উপায় কি ? তুমি আমাকে আনিয়াছ, তুমিই ইহার একটা উপায় কর।"

গঙ্গদত্ত উত্তর করিল,—"আমার শত্রু তো নিপাত হইয়াছে। এখন আপনি চলিয়া যাইতে পারেন।"

এ কথায় সাপের বড় রাগ হইল। সে কহিল, "এ কেমন কথা ? আমি এখন কি করিয়া বাহির হইব ? হয় ত আমার বাসায় অন্য সাপে বাসা লইয়াছে। এই অবস্থায় আমি কিছুতেই যাইব না। যদি ভাল চাও, নিজ পরিবার হইতে রোজ রোজ এক একটা করিয়া ব্যাঙ্ দিতে থাক, নচেৎ সকলে এককালে মারা যাইবে।"

সাপের কথায় গঙ্গদত্তের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে তখন নিজ দুর্ব্বুদ্ধির জন্য চিন্তা করিতে করিতে কহিল,—'হায়, আমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! এ-কে নিষেধ করিলে বা এর সহিত ঝগড়া করিলে তো রক্ষা নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র, অত বড় ক্ষমতাশালী জীবের সহিত মিত্রতা করা আমার বড়ই অসঙ্গত হইয়াছে। এখন অনুতাপ করিলে আর কি হইবে ? নিজ পরিবার হইতে এক একজনকে পাঠাইতেই হইবে। শাস্ত্রে আছে, "সর্ব্বস্ব যাওয়ার চাইতে অর্দ্ধেক দিয়া রক্ষা পাইলে তাহা করিতে হয়। তা-ই পণ্ডিতের কাজ।' কিন্তু আমি অর্দ্ধেক দিয়াও পাইব কি ?"

ব্যাঙের আর উপায় নাই। সাপের আহারের জন্য রোজ

রোজ এক একটী করিয়া ব্যাঙ্ নিজ পরিবার হইতে পাঠাইতে লাগিল। এতে কি আর সাপের পেট ভরে? সে গঙ্গদত্তের অসাক্ষাতে কত ব্যাঙ্ ধরিয়া খাইতে লাগিল। অবশেষে এই হইল, সাপটা গঙ্গদত্তের ছেলে যমুনাদত্তকে পর্য্যন্ত ধরিয়া খাইয়া ফেলিল!

গঙ্গদত্তের কত কান্না, কত অনুতাপ। কিন্তু সেই অনুতাপে ফল কি? গঙ্গদত্তের স্ত্রী বড়ই কাতর হইল। সে স্বামীর বোকামীর জন্য তাকে কত ধিক্কার দিল। এত যে আত্মীয় স্বজনের সর্ব্বনাশ, তার কারণও গঙ্গদত্ত, ইহা বলিয়া সে স্বামীকে কত তিরস্কার করিল। উপায় না দেখিয়া স্ত্রী স্বামীকে কহিল, "আর অনুতাপ করিলে ফল নাই। যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, এখনই এই কুঁয়ো হইতে পলাইয়া যাও, না হয় এই সাপটাকে মারিয়া ফেলিবার ফন্দি কর।"

আর দেরী হইল না। দুই এক দিনের মধ্যেই ব্যাঙের বংশ নির্ম্মূল হইল, কেবল বাকী গঙ্গদত্ত। সাপ গঙ্গদত্তকে কহিল, "ভাই, ব্যাঙ্‌তো সব গেল,—আছ মাত্র তুমি। এখন আমার আহারের উপায় কি? ক্ষুধার জ্বালায় পেট যে গেল। শীঘ্র কিছু বন্দোবস্ত কর, নচেৎ মারা যাই। আমায় তুমিই আনিয়াছ, এখন তুমি আহারের বন্দোবস্ত করিবে না কি?"

গঙ্গদত্ত এবার একটু চালাকী খেলিল। নিজের প্রাণের ভয়ে কে কি না করে? সে কহিল, "মিত্র, সে বিষয়ে আর কথা

কি ? আপনার ভয় নাই, আমি অন্য কূপ হইতে বিস্তর ব্যাঙ্ লইয়া আসিতেছি।”

সাপ তো ভারি খুসী। সে কহিল, “হাঁ, হাঁ, এখনই যাও, দেরী করিও না। তুমি আমার মিত্র, ভ্রাতৃতুল্য। যদি এই কাজটা কর, তবে পিতার কাজ করিবে।”

ব্যাঙ্ তো প্রাণে রক্ষা পাইয়া আহ্লাদে তখনই কূপ ছাড়িয়া পলাইল। সাপ অপেক্ষায় রহিল গঙ্গদত্ত কখন ফিরিবে। অনেক সময় গেল, গঙ্গদত্ত আর ফিরে না। সাপের বড় ভাবনা হইল। যত সময় যাইতে লাগিল, ততই সাপের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। যখন দেখিল গঙ্গদত্ত আর আসেই না, তখন সে এক গোসাপকে ডাকিয়া কহিল, “তুমি দয়া করিলে বড় উপকার হয়। গঙ্গদত্তকে তো তুমি খুব চেন। সে নিকটে কোন জলাশয়ে গিয়াছে। তুমি আমার হইয়া তাহাকে কয়েকটি কথা বলিয়া এস। তাহাকে বলিবে, অন্য কিছু না পাইলে সে এখনই ফিরিয়া আসে। আমি একাকী আর থাকিতে পারি না। এ কথাও বলিও আমি তাহার কোন অনিষ্ট করিব না। যদি আমার কথা ভঙ্গ হয়, আমার সমস্ত পুণ্য তার হইবে।”

গোসাপ গঙ্গদত্তের তালাসে গেল। একটু দূরেই সে তাকে এক কূপের মধ্যে দেখিতে পাইল। তখন গোসাপ গঙ্গদত্তকে সব কথা কহিল। গঙ্গদত্ত উত্তর করিল,—“বাপ্ রে, আমি যাইব না। শাস্ত্রে আছে, ‘যে ক্ষুধাতুর, সে সকল পাপকর্ম্মই করিতে

পারে।' এ কথা তাহাকে যাইয়া বল আমি আর সে কূপে যাইব না, তার কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

এই কথা বলিয়া ব্যাং গোসাপকে বিদায় করিয়া দিল।

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ—

গল্পটি বলিয়াই বানর কুমীরকে কহিল, "ওরে দুষ্ট, আমিও সেই গঙ্গদত্তের মত তোর বাড়ীতে আর যাইব না। বাবা, ক্ষুধাতুরকে কি বিশ্বাস করিতে আছে?"

কুমীর শুনিয়া কহিল, "আর আমাকে গালাগালি করা তোমার উচিত নয়। চল একবার আমাদের বাড়ী চল, এখনই ফিরিয়া আসিবে। তুমি না গেলে আমার বড় পাপ হইবে। এই আমি বসিলাম, তুমি না গেলে, আমি না খাইয়া এখানে মরিব।"

বানর কহিল,—"আমি লম্বকর্ণের মত অত বোকা নই যে আপনিই আপনাকে মারিয়া ফেলিব। আমি কখনো তোমার বাড়ীতে যাইব না।"

কুমীর জিজ্ঞাসা করিল,—"লম্বকর্ণ কে? সে কি করিয়া আপনিই আপনাকে মারিয়াছিল?"

বানর লম্বকর্ণের উপাখ্যান কহিতে লাগিল:—

শাখা গল্প ২—

লম্বকর্ণ গাধার উপাখ্যান।

এক বনে একটা সিংহ বাস করিত। তার নাম 'করাল কেশর'। সে-ই সেই বনের রাজা,—অন্যান্য পশুরা তার ভয়ে সর্ব্বদা কাঁপিত। তার চাকর ছিল একটা শেয়াল,—তার নাম 'ধূমরক'।

একদিন সেই সিংহ শিকার করিতে গেল। তার সম্মুখে একটা হাতী পড়িল। সিংহ আক্রমণ করিলে, দুই জনের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হাতীর শরীরে তো কম জোড় নয়, সিংহটা সেই যুদ্ধে খুব আঘাত পাইল, এমন কি চলাফেরা করিতেও তার কষ্ট হইত। আর সে শিকার করিতে যাইতেও পারে না,—ভাল আহারও তার জোটে না। সিংহের বড় কষ্ট।

কর্ত্তার কষ্ট, চাকরেরও ভারি কষ্ট। ক্ষমতা নাই, শক্তি নাই, সিংহ ক্ষুধায় জ্বলিলেও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। চাকর শৃগালের কিন্তু ভারি রাগ হইল। কর্ত্তার কষ্ট হয় হউক, চাকর সে জন্য কষ্ট ভুগিবে কেন? চাকরী তো সুখের জন্য? একদিন শৃগাল সিংহকে কহিল,—"প্রভু, ক্ষুধায় আর তো প্রাণ বাঁচে না। দেখুন, না খেয়ে খেয়ে সারা হইলাম,—আর চলিতে শক্তি নাই। আপনাকে কিরূপে শুশ্রূষা করিব?

সিংহ বড় লজ্জিত হইয়া কহিল, "ধূম্রক, আমার নিজের তো আর চলিতে শক্তি নাই। তুমি কোন পশুকে এখানে আনিতে চেষ্টা কর। এই যে আমার শক্তি-সামর্থ্য নাই দেখিতেছ, তবু আমি শিকার ধরিতে পারিব।"

এ কথায় শৃগালের তো মহা আহ্লাদ হইল; সে তখনই শিকার খুঁজিয়া আনিতে চলিল। অতি শীঘ্রই সে নিকটের এক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল একটা গাধা। তার গায়ে বড় মাংস নাই—খাইতে না পাইয়া এমনই শুকাইয়াছে। সে অতি কষ্টে একটা দীঘির পাড়ে ঘাস খাইতেছে। শৃগালের ভারি আনন্দ হইল। সে তখনি গাধাটার কাছে যাইয়া কহিল, "মামা, নমস্কার। আজ বড় সৌভাগ্য যে আপনার সহিত দেখা হইল। আপনি এত কাহিল হইয়াছেন কেন?"

সেই গাধাটার নাম লম্বকর্ণ; সে শৃগালকে কহিল, "ভাগিনে, আমার দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা কর কি? আমার মনিব তো এক ধোপা. সে যে নিষ্ঠুর,—তার দয়া মায়া নাই। দেখ, আমার শক্তি নাই, তবু কত ভার বহন করি! আমায় তবু এক মুঠো ঘাস খাইতে দেয় না। সমস্ত কাজ হইলে—সন্ধ্যা বেলা এই দীঘির পাড়ে এই ঘাস খাই, তাতে কত ধূলোবালী। এতে কি আর শরীর থাকে, বাপু?"

শেয়াল বড় চতুর, সে তাহার দুঃখে দুঃখ জানাইয়া কহিল, "মামা, আপনার তো তবে বড়ই কষ্ট! আমি কিন্তু একটা

উপায় বলিতে পারি। তাতে আর আপনার কষ্ট থাকিবে না।” গাধা আনন্দিত হইয়া কহিল, “উপায়টা কি, বাবা, বল না?”

শৃগাল কহিল—“এখান থেকে একটু দূরেই একটি নদী আছে। তার পাড়ে ঘাসের অন্ত নাই। আহা কি সুন্দর লম্বা লম্বা ঘাস! আমার সঙ্গে চলুন, দেখিবেন কেমন ঘাস! সে ঘাস খাইলে আর আপনার ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা হইবে না। আমরা মামা ভাগিনে সেখানে খুব সুখে থাকিতে পারিব।”

লম্বকর্ণের বড়ই লোভ হইল, কিন্তু প্রাণের ভয়ে সে দূরে যাইতে ভরসা পাইল না। সে কহিল, “বাপু, কথা তো ঠিক। তবে আমরা গৃহপালিত পশু কিনা, দূরে গেলে হয়ত কোন বনজন্তুতে ধরিয়া মারিয়া ফেলিবে। আমার অতদূরে যাওয়া উচিত নয়।”

শেয়াল বড় চতুর, সে তখনি কহিল, “ওকি, মামা, ওকথা মুখে আনিবেন না। আমি সে দেশের রাজা, সেখানে আর কি কোন পশু আসিতে পারে? আপনার কোন ভয় নাই। আরো একটা সুখের কথা। সেখানে ধোপার যন্ত্রণায় তিনটা গর্দ্দভী পলাইয়া আছে। তাদের শরীরের অবস্থা আপনার মতই ছিল। এখন সেখানে খাইতে পাইয়া তাহারা বেশ মোটাসোটা হইয়া পড়িয়াছে! আপনি গেলে তাদের বিবাহও করিতে পারেন, মহাসুখে ঘর সংসারও করিতে পারেন।”

লম্বকর্ণের ভারি লোভ হইল। একে ঘাসের কথা, তার উপর বিবাহের কথা, গাধাটা কি আর স্থির থাকিতে পারে? সে বলিয়া উঠিল, "আহা, এমন হইলে আর মন্দ কি? চল, চল এখনই যাই।"

গাধা লম্বকর্ণ শেয়ালের সঙ্গে মহা আনন্দে চলিল। তাহার আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সমস্ত রাস্তায় সে শেয়ালকে কত কথা শুনাইতে লাগিল। শেয়াল নানা কথায় ভুলাইয়া গাধাটাকে একেবারে সেই সিংহের মুখের কাছে লইয়া যাইয়া হাজির করিল!

সিংহটা তখন বেদনায় বড় কাতর ছিল। সে আর তখন শিকার ধরিতে প্রস্তুতও ছিল না। সে যেমন গাধাকে ধরিতে যাইবে, অমনি গাধা প্রাণের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। সিংহ একটা থাবা মারিল বটে, কিন্তু তাহা ফস্‌কাইয়া গেল।

শিকার চলিয়া গেল দেখিয়া শেয়ালের বড় রাগ হইল। সে সিংহকে কত ঠাট্টা, কত উপহাস করিল। অবশেষে কহিল, "কত কষ্ট করিয়া শিকার আনিলাম, ধরিতে পারিলে না এখন তোমার বল বিক্রম সবই বোঝা গিয়াছে। একটা হাতী আনিলে যে কি হইত বলিতে পারি না!"

শেয়ালের পরিহাসে সিংহের রাগ হইল না। সে হাসিয়া কহিল, "ধূম্রক, রাগ করিও না। আমার শরীরের বেদনায় আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই গাধাটা পলাইতে পারিয়াছে।

মনে রাখিও, এখনও এমন শক্তি আছে, আমার সম্মুখে পড়িলে হাতীরও নিস্তার নাই।"

শৃগাল বলিল,—"আচ্ছা, সে কথায় আর দরকার নাই। আমি আবার গাধাটাকে আপনার কাছে আনিতেছি। এবার কিন্তু প্রস্তুত থাকুন, এবার যেন ফস্‌কাইয়া যায় না।"

সিংহ কহিল,—"ওহে শেয়াল, আর গাধাটার কাছে যাইও না। সে আমায় নিজে দেখিয়া গিয়াছে। সে কি আর আসিবে? এবার অন্য জন্তুর চেষ্টা দেখ।"

শেয়াল যে বড় চতুর-চালাক, সে তাহা নানা কথায় প্রকাশ করিল। অবশেষে সে কহিল, "ও কথায় আপনার দরকার নাই। তাহাকে আনিতে পারি আর না পারি, সে কাজ আমার। আপনি তো প্রস্তুত থাকুন!"

সিংহ এবার খুব প্রস্তুত রহিল। শেয়াল শিকার আনিতে চলিল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া আগের জায়গায়ই গাধাটাকে চরিতে দেখিল। শৃগাল নিকটে গেলেই গাধা কহিল, "বা বেশ বাপু, তুমি আমাকে খুব ভাল জায়গায়ই কিন্তু লইয়া গিয়াছিলে। এযে একবারে যমের মুখে! কি থাবাই দিয়াছিল, বাবা! ভাগ্যিস্ রক্ষা পাইয়াছি। বাপু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ থাবাটা কোন্ জন্তুর?"

শেয়াল হাসিতে হাসিতে কহিল, "বেশ, মামা, আপনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না? সেটা যে গর্দ্দভী! সে আপনাকে

আদর করিয়া ধরিতে আসিয়াছিল, আপনি যে ভীতু, একেবারে ভয়ে দৌড়াইলেন! যখন একান্তই দৌড়াইতে উদ্যত হইলেন, সে তখন আপনাকে হাত দিয়া ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। আপনি তো দৌড়িয়া গেলেন, বেচারীর কত কান্না! সে আর অন্ন জল ধরে না। চলুন, শীঘ্র চলুন, তা' না হইলে স্ত্রীহত্যার ভাগী হইবেন। চলুন, আপনার কোন ভয় নাই।"

গাধা তো গাধা। সে আবার শেয়ালের কথায় বিশ্বাস করিল। দুই জনে সেই নদীর ধারে যাইতে আবার হাঁটিতে লাগিল। বুদ্ধি থাকিলে কি আর সে যাইত? শাস্ত্রে আছে, "লোকের বুদ্ধি সকল সময়ে ঠিক থাকে না। দৈব প্রতিকূল হইলে, বুদ্ধিও লোপ পায়। বুদ্ধি লোপ পাইলে কুকর্ম্ম বলিয়া কোন কাজে ঘৃণা থাকে না,—সে তখন সকল কাজই করিতে পারে।"

সিংহ তো শিকার ধরিতে ঠিক হইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময়ে বোকা গাধাটাকে লইয়া শেয়াল সেখানে উপস্থিত হইল। এবার কি আর দেরী হয়, না ভুল হয়? সিংহ তখনই গাধাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল।

আহা, গাধাটার বোকামীর কি ফল? মৃত্যু। ধূর্ত্তের সহিত—দুষ্টের সহিত খাতির, আত্মীয়তা বা আলাপ-পরিচয় করিলে, কি তাহাকে বিশ্বাস করিলে কি সর্ব্বনাশই হয়!

সিংহ তো গাধাটাকে মারিয়া ফেলিল। সে শৃগালকে পাহারায় রাখিয়া নদীতে স্নান করিতে গেল। শৃগাল বড় ধূর্ত্ত, তাহাতে

তার বড় ক্ষুধা। শৃগাল কি আর লোভ চাপিয়া রাখিতে পারে? সে তখনই গাধাটার কাণ আর বুকের মাংস খাইয়া ফেলিল।

সিংহেরও বড় ক্ষুধা, সে খুব তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া মাংস খাইতে আসিল। আসিয়াই দেখিল গাধাটার কাণও নাই, বুকের মাংসও নাই। সিংহের বড় রাগ হইল। সে কহিল, "ওরে দুষ্ট, এ কি করিলি? তুই যে আগেই কাণ আর বুকের মাংস খাইয়া উচ্ছিষ্ট রাখিয়া দিলি?"

শেয়ালের প্রাণে বড় ভয় হইল। সে হাত যোড় করিয়া কহিল, "প্রভু, ওকি কথা কহিতেছেন? এ গাধাটার আগ অবধিই কাণ আর বুক নাই। থাকিলে কি পলাইয়া গিয়া আবার এখানে আসে?"

সিহ ভাবিল কথাটা ঠিক। তখন দুইজনে শিকার ভাগ করিয়া খাইল। ধূর্ত্তের হাতে পড়িলে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও লোপ পায়!

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ।

বানর কুমীরটাকে এই গল্প শুনাইয়া কহিল, "এইজন্যই কহিতেছি, আমি লম্বকর্ণের মত তোর সঙ্গে যাইয়া প্রাণ হারাইতে চাই না। তুই যে কেমন জীব, তাহা আমার জানা আছে; তুই কপট, ধূর্ত্ত, মিথ্যুক, অবিশ্বাসী। আমাকে ফাঁদে ফেলিতে এখন কত কথাই কহিবি! আগে মিথ্যা কহিয়াছিস্ এখন সত্য

কহিলে কে বিশ্বাস করিবে ? আমি কিছুতেই তোর সঙ্গে যাইব না। যুধিষ্ঠির নামে এক কুমারের গল্প জানিস্ ? না জানিস্ তো, শোন্ ঃ—

শাখা গল্প ৩—

যুধিষ্ঠির কুমারের উপাখ্যান।

"এক গ্রামে এক কুমার ছিল,—তার নাম যুধিষ্ঠির। কুমারের বাড়ীর চারি পাশে মেলাই খোলা পড়িয়া থাকে। তাতে আছাড় পড়িলে হাত কাটে, পা কাটে। একদিন যুধিষ্ঠির দৌড়িয়া যাইতে আছাড় পড়ে। তাতে তার কপাল একটু কাটিয়া যায়। ঘা আর সারে না। কুমার বড় পেটুকও ছিল। রোজ রোজ যা'-তা' খাইত, তাহাতে ঘা বাড়িয়াই যায়। শেষে অনেক ঔষধপত্রে ঘা শুকায়। কিন্তু কপালের দাগটা খুব বড় থাকে।

একবার দেশে ভারি দুর্ভিক্ষ হইল। লোকে খাইতে না পাইয়া মরিতে লাগিল। দেশে হাহাকার উঠিল। যুধিষ্ঠিরের তো আর পেট চলে না। অগত্যা আর এক দেশে যাইয়া সে সেই দেশের রাজার চাকর হইল। যুধিষ্ঠির বেশ সুন্দর ও জোয়ান, কপালে অত বড় চিহ্ন,—রাজা বুঝিলেন এ অবশ্যই বীর পুরুষ! রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভারি যত্ন করেন, রাজকুমারদের মত স্নেহ করেন, ভাল ভাল পোষাক পরিতে দেন। কুমারের ভারি সুখ।

রাজকুমারেরা কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পারিতেন না। রাগ হইলেও বাপের ভয়ে তাঁরা কিছু বলিতেন না।

সেই রাজার ইচ্ছা হইল রাজ্যের বীরদের কৌশল দেখিবেন। দিন স্থির হইল। রাজ্যের যত বীরেরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাজার বড় ইচ্ছা যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধের কৌশল দেখায়। তিনি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে বিদেশীয় রাজপুত্র, তুমি কোন্ জাতি? তোমার নাম কি? কোন্ যুদ্ধে তুমি কপালে এই আঘাত পাইয়াছিলে?"

যুধিষ্ঠির তো অবাক! সে তখনই হাত যোড় করিয়া কহিল, "মহারাজ, এ আমার অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নয়। আমি জাতিতে কুমার, আমার নাম যুধিষ্ঠির। হঠাৎ দৌড়িয়া যাইতে খোলার উপর আছাড় পড়িয়া কপালে এই দাগ হইয়াছে।"

শুনিয়া লজ্জায় রাজার মুখ কালো হইল। তিনি পাহারাদারদের হুকুম করিলেন, "এ বেটাকে এখনই গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও। আমি মনে করিয়াছিলাম, এ কোন রাজপুত্র! এ বেটা যে কুমার, তা কে জানিত!"

প্রহরীরা তো আসিল। সেই যমমূর্ত্তি দেখিয়া কুমারের আত্মা শুকাইয়া গেল। সে কাতর হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, এমন কঠিন আজ্ঞা করিবেন না। আমি যুদ্ধবিদ্যাও জানি, একবার পরীক্ষা করুন।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া রাজা হাসিলেন, আর কহিলেন, "তোমার যে বিদ্যা, তা আর বুঝিতে বাকী নাই। ভাল চাও তো এখনি পলাইয়া যাও। একটা কথা আছে, 'তুমি লোকটা তো ভালই, কেবল হাতী মারিতে পার না।' তোমার গুণও তেমনি। যাও, যাও, এখনই চলিয়া যাও।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল, "এই কথাটা কি, মহারাজ?" রাজা কহিলেন এই গল্পটি শোন নাই? তবে শোন :—

শাখা গল্প ৪—

সিংহের বাচ্চা ও শেয়ালের বাচ্চার উপাখ্যান।

"এক দেশে একটা বড় বন ছিল। সেখানে এক যোড়া সিংহ সিংহী বাস করিত। কালে সিংহীর দুটি বাচ্চা জন্মে। সিংহী আর ছানা রাখিয়া শিকারে যাইত না, সিংহই বন জঙ্গল বেড়াইয়া শিকার লইয়া আসিত। তাতেই দুইজনের আহার চলিত :

কিছুদিন যায়, একদিন সিংহ তো শিকারে বাহির হইয়াছে। বহু বন-জঙ্গল ঘুরিল, সে আর শিকার পাইল না। সিংহের তো মহা ভাবনা, সে নিজে বা কি খাইবে, সিংহীকে বা কি খাওয়াইবে। ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা গেল, সিংহ কিছুই পাইল না। মনের দুঃখে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া সিংহ নিজের ঘরে ফিরিয়া চলিল।

হঠাৎ সিংহ একটা শেয়াল-বাচ্চা দেখিতে পাইল। সে তখনই তাহাকে ধরিল, কিন্তু মারিল না। সে মুখে ধরিয়া সিংহীর নিকট লইয়া গেল।

সিংহ আজ বড় লজ্জিত। সে সিংহীকে কহিল, "আজ তো কিছু শিকারে পাইলাম না। যে যৎসামান্য পাইয়াছি, তাহাতে তুমি কিছু ক্ষুধা নিবারণ কর। আমি কিন্তু উহাকে মারিতে পারিব না। শাস্ত্রে আছে, 'প্রাণ গেলেও স্ত্রীলোক বা বালককে নষ্ট করিতে নাই।' তুমি তো আজ ইহাকে খাও, কাল বাহির হইয়া যা'হয় করিব।"

সিংহী কহিল, "শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তুমি নিজে মারিলে না, আর আমাকে মারিতে বলিতেছ? আমিই বা ইহাকে মারি কি করিয়া? শাস্ত্রে এও তো আছে, 'প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইলেও কুকাজ করিতে নাই।' দয়া প্রধান ধর্ম্ম, তাহা রাখিতেই হয়। আমি এই বাচ্চাটুকু মারিয়া কি করিব? আমি ইহাকে তৃতীয় পুত্র করিলাম।"

এই বলিয়াই সিংহী শেয়াল-বাচ্চাকে মাই দিতে লাগিল। এই রকমে কিছুদিন গেল। শেয়াল-বাচ্চা সিংহীর মাই খাইয়া খুব মোটাসোটা হইয়া উঠিল। সে সিংহের দুই বাচ্চার সহিত একসঙ্গে বেড়ায়, একসঙ্গে খেলা করে। সিংহের বাচ্চারা শেয়াল-বাচ্চাটাকে সিংহের বাচ্চাই মনে করিত।

একদিন সিংহী শুইয়া আছে, সিংহ শিকারে বাহির হইয়াছে।

সিংহের বাচ্চার হস্তী আক্রমণ ও শেয়াল ছানার পলায়ন

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

মস্ত বন—বাচ্চাগুলি একবার মার মাই খায় আবার এদিক ওদিক দৌড়াইয়া মার কাছে আসে। বাচ্চাগুলি তো একদিন খেলিতে খেলিতে কিছু দূর বনে গিয়া পড়িল। সেই সময়ে একটা বুনো হাতীও বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে উপস্থিত। হাতী দেখিয়াই তো দুই সিংহের বাচ্চা রাগিয়া উঠিল। তাহারা কেশর ফুলাইয়া হাতীটাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া গেল। শেয়াল-বাচ্চা ভাবিল মহা বিপদ, প্রাণে বুঝি মারা যায়। সে কাঁপিয়া সিংহের বাচ্চা দুটোকে ডাকিয়া কহিল, "ও বাবা, এ যে হাতী, এখনই পায়ে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিবে। তোমাদের যা' ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু মার কাছে চলিলাম।"

এই কথা বলিয়াই শেয়াল-ছানা ভয়ে পলাইতে লাগিল। বড় ভাই পলাইতেছে, ইহা দেখিয়া ছোট ভাইয়েরা আর কি করিবে? তারা আর হাতীটাকে তাড়া না করিয়া এই কথা মাকে বলিতে ঘরে ফিরিল। সেই সময়ে সিংহ সিংহী দুইয়েই উপস্থিত। সিংহের বাচ্চারা যাইয়া কহিল, "দেখেছ মা, দাদার কাজ। হাতী দেখিয়াই তিনি পলাইয়াছেন! আমরা দুই ভাই কিন্তু হাতীটাকে মারিতে দৌড়িয়াছিলাম।"

এ কথায় শেয়াল-ছানার বড়ই রাগ হইল। সে সিংহের বাচ্চা দুটোকে যাচ্ছে-তাই গালাগালি করিতে লাগিল। দাদা গালি দেন, ছোট ভাইয়েরা চুপ করিয়া রহিল। সিংহ সিংহীর কিন্তু শেয়াল-ছানার এই ব্যবহারটা ভাল লাগিল না।

সকলের রাগ কমিল। সিংহী শেয়াল-ছানাটাকে দূরে লইয়া যাইয়া কহিল, "বাছা, ওরা তোমার ছোট ভাই, তাদের ও রকম গালি দিতে আছে কি ?"

শেয়াল-ছানা এ কথায় আরো রাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি ওদের চাইতে কিসে কম যে আমাকে অমন ঠাট্টা করে ? আমার কি রূপ কম, না গুণ কম, না সাহস কম ? ওরা আমাকে বড়ই অপমান করিয়াছে, আমি কিন্তু উহাদিগকে মারিয়া ফেলিব, মা।"

একথা শুনিয়া সিংহী হাসিতে হাসিতে কহিল, "ওকথা কি মুখে আনিতে আছে, বাবা ? তুমি রূপে, গুণে, সাহসে কম হইবে কেন ? কিন্তু তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, তাতে তোমার হাতী মারিবার ক্ষমতা নাই। তুমি তো জান না, বাছা, তুমি কে। তুমি যে শেয়াল-ছানা,—আর ওরা সিংহের বাচ্চা। আমি দয়া করিয়া মাই দিয়া তোমাকে এত বড় করিয়াছি। আমার বাচ্চা-গুলি এখনও অতি শিশু, তোমাকে চিনিতে পারে না। চিনিলে তোমার রক্ষা নাই। তুমি এখনও পলাও,—আপন দলে যাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। নচেৎ এখনই তাহারা ধরিয়া তোমায় মারিয়া ফেলিবে।"

শেয়াল-ছানার বড় ভয় হইল। সে একবারে এক দৌড়ে পলাইল। আপন জাতির মধ্যে মিলিয়া সে প্রাণে রক্ষা পাইল।"

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

এই গল্পটি শেষ করিয়াই রাজা সেই কুমারকে কহিলেন, "বাছা, রাজকুমারেরা এখনও তোমাকে কুমার বলিয়া জানে না। জানিতে পারিলে তোমার নিস্তার নাই। তুমি এখনও পলাও, প্রাণ রক্ষা কর।"

কুমার আর কি দেরী করে? সে তখনই কাহাকে কিছু না বলিয়া রাজবাড়ী ছাড়িয়া পলাইল।"

*　　*　　*

প্রধান গল্পারম্ভ।

গল্পটি তো শেষ হইল। তখন বানর কুমীরকে কহিল, "এই জন্যই কহিয়াছিলাম—যুধিষ্ঠিরের মত তুই সত্য কহিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিতেছিস্। তাহা কি পারিবি? তুই বড় বোকা, তুই স্ত্রীর কথায় কি অন্যায় কাজ করিতেছিলি? তুই জানিস্ না স্ত্রীলোক বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিতে পারে? তাহার কথায় যে বিশ্বাস করে তাহার মত বোকা এ দুনিয়ায় নাই।"

এত গালাগালির পর কুমীর বানরকে কত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। বানর আবার কহিল, "তুই তো নন্দ আর বররুচির" মত স্ত্রীর বাধ্য। যারা স্ত্রীর বাধ্য, তারা কি না করিতে পারে? তুই তো কাপুরুষ, মেয়েমানুষের অধম। তোর মুখ দেখিলে পাপ হয়। যা, যা, তুই এখান থেকে চলিয়া যা।"

কুমীর জিজ্ঞাসা করিল,—'নন্দ ও বররুচির' গল্পটি কি ভাই?'
বানর কহিল,—'তাও জানিস্‌নে? তবে শোন্‌ঃ—

শাখা গল্প ৫—

নন্দরাজা ও বররুচি মন্ত্রীর উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম নন্দ। তাঁর এক মন্ত্রী ছিল,—তাঁর নাম বররুচি। রাজা স্ত্রীর বড় বাধ্য, তাঁর কথায় উঠেন, বসেন। যেমন রাজা, তেমনই মন্ত্রী। মন্ত্রী ও স্ত্রীর বড় বাধ্য,—যা স্ত্রী করিতে বলেন, তিনি তা করেন, স্ত্রীই যেন তাঁর দেবতা।

এক দিন মন্ত্রীর সহিত তাঁর স্ত্রীর কথার কাটাকাটি হয়। কথায় কথায় ঝগড়ার মত হয়। মন্ত্রীর স্ত্রীতো কালনাগিনীর মত রাগিয়া উঠিলেন। তাঁর মান হইল,—তিনি আর স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন না। মন্ত্রী আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি কত হাতে পায়ে ধরিলেন, কত সাধ্য সাধনা করিলেন, স্ত্রীর অভিমান আর কিছুতেই গেল না। তখন মন্ত্রী কহিলেন, 'আহা এত হাতে পায়ে ধরিলাম, তাহাতেও রাগ গেল না? এই রাগ কিসে যে যায়, বল তো? আমি তা করিতেই প্রস্তুত আছি।'

তবু কি মন্ত্রীর স্ত্রীর রাগ যায়? মন্ত্রী কত সাধেন, স্ত্রীর

কথা নাই। শেষে সাধিতে সাধিতে স্ত্রী কহিলেন, "যদি তু মাথা মুড়াইয়া আমার পায় পড়িতে পার, তবে এই রাগ যায়।"

মন্ত্রীর আর দেরী নাই। তিনি তখনই মাথা মুড়াইয়া স্ত্রীর পায়ে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। ইহাতে স্ত্রীর রাগ গেল, মন্ত্রী প্রাণে বাঁচিলেন।

নন্দ রাজার রাণীও একদিন এমন রাগিয়াছিলেন। সে কি রাগ,—যেন আগুন। রাজাতো অস্থির। রাণীর রাগ আর থামে না। রাজা কত সাধেন, কত হাতে পায়ে পড়েন, কত মূল্যবান জিনিষ দিতে চান, কিছুতেই রাগ যায় না। রাজা কত কাকুতি মিনতি করেন, রাণী কথাও কহেন না, আরো গালাগালি করেন; দুই এক দিন ঘোর অভিমানে রাণী কাটাইলেন। রাজা কত রকম করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা পান, অভিমানিনার অভিমান কি আর থামে? অবশেষে রাণী কহিলেন, "যদি এক কাজ কর, তবে আমার রাগ যায়।"

রাজাতো খুব খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেইটা কি?" রাণী কহিলেন, "যদি তুমি ঘোড়ার মত চারি পায়ে চল, মুখে লাগাম লও, আর আমি তোমার পিঠে চড়িয়া তোমাকে চাবুক মারিব, তুমি হি, হি শব্দ করিতে করিতে আমাকে লইয়া দৌড়াইতে পার, তবে আমার রাগ যায়।"

রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন। স্ত্রীর বশ হইলে লোকে কি না করিতে পারে? এতো সামান্য কথা। রাজা ঘোড়া

হইলেন, রাণী তাঁহার পিঠে চড়িয়া খুব চাবুক লাগাইলেন, রাজা হি হি করিতে করিতে রাণীকে লইয়া দৌড়াইলেন! রাণীর রাগ গেল, রাজা প্রাণ পাইলেন।

এতো গেল রাত্রের ব্যাপার। যেমন সভা বসে, তেমনি পরদিন সভা বসিল। মন্ত্রী বররুচি আসিয়া উপস্থিত। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "মন্ত্রী, এ কি? মুড়ো মাথা কেন? কোন তেহার-পর্ব্ব আজ কাল তো যায় নাই?"

বররুচি উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আর কি বলিব? স্ত্রীর বাক্যে লোকে কি না দেয়, আর কি না করে? মানুষ ঘোড়া হইয়া হি হি করে, তেহার-পর্ব্ব না থাকিলেও লোকে মাথা মুড়োয়।"

রাজার মুখে আর কথা নাই। লজ্জায় তাঁহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। মন্ত্রীও বড় লজ্জা পাইলেন। সভাতে হাস্যের রোল পড়িয়া গেল। স্ত্রীর বশ হইলে কি মানুষ মানুষ থাকে?

* * * *

প্রধান গল্পারম্ভ।

গল্পটি বলিয়াই বানর কুমীরকে কহিল, "আরে দুষ্ট, এই জন্যই কহিয়াছিলাম নন্দ ও বররুচির মত স্ত্রীর কথায় এই কুকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলি। স্ত্রীলোকের কথায় যে বিশ্বাস করে, তাঁহার মত মূর্খ এই জগতে নাই।"

কুমীর আর কি কহিবে? সে তো চুপ করিয়া রহিল। বানর

কহিল, "তুই তো স্ত্রীর কথায় আমাকে মারিতে আসিয়াছিস্। তোর মনের ভাব কথাতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। লোকে যত চেষ্টা করুক, 'মনের ভাব গোপন করিতে যাইয়া কথার দোষে তাহা বাহির হইয়া পড়ে।' এই বিষয়ে একটা গল্প আছে, শোন্ :—

শাখাগল্প ৬—

বাঘের চামে-ঢাকা গাধার উপাখ্যান।

কোন এক গ্রামে এক ধোপা ছিল। তার নাম শুদ্ধপট। তার ছিল একটা গাধা। ধোপা তাহা দ্বারা কাপড়ের বোঝা বহাইত। ধোপার অবস্থা বড় ভাল ছিল না,—সে গাধাটাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতেও পারিত না। সর্ব্বদা বোঝা বয়, তাতে ভাল খোরাক নাই, গাধাটাতো খাটিয়া খাটিয়া খুব কাহিল হইতে লাগিল।

সেই ধোপা কোন কাঠ-খড়ি কিনিত না,—সে জঙ্গল হইতে কুড়াইয়া আনিত। একদিন সে তো কাঠ কুড়াইতে গিয়াছে। কতকদূর যাইয়াই সে দেখিল একটা বাঘ পড়িয়া রহিয়াছে,—সেইটা মরা। ধোপার মনে বড় আনন্দ হইল। সে মনে করিল,—"বা, বেশ হইয়াছে, আমি এই বাঘের চামড়াটা বাড়ী লইয়া যাইব। আমার যে গাধা আছে, আমি এই চামড়ায় ঢাকিয়া

তাহাকে পরের ক্ষেতে চরিতে ছাড়িয়া দিব। বাঘ বলিয়া ভয়ে কেউ তার কাছেও যাইবে না, কেউ তাড়াও করিবে না।"

ধোপার যেই কথা সেই কাজ। সে বাঘের চামড়াটা বাড়ী লইয়া আসিল। রোজ রোজই সে গাধাটাকে সেই বাঘের চামে ঢাকিয়া পরের ক্ষেতে ছাড়িয়া দেয়। গাধাটা বিস্তর খাইয়া দেখিতে দেখিতে খুব মোটাসোটা হইল। তার গায়ে এখন খুব জোর, ধোপা আর তাহাকে সহজে ধরিতেও পারে না, বাঁধিতেও পারে না। গাধার ভারি মজা, সে রোজ রোজ ক্ষেতে যায়, আর খুব পেট ভরিয়া খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়!

গাধাটা তো একদিন ক্ষেতে গিয়াছে,—যা' পায় তা-ই খাইতেছে। লোকে মনে করিল ঐটা বাঘ,—ভয়ে কেউ শব্দ করিল না। দৈবাৎ তখন কিছু দূরে আর একটা গাধা চেঁচাইতেছিল। আর কি গাধা স্থির থাকিতে পারে? সেও চীৎকার আরম্ভ করিল। ক্ষেতের মালীক তখন বুঝিল এইটা বাঘ নয়, বাঘের চামড়া-ঢাকা একটা গাধা! তখন আর গাধা যায় কোথায়! সকলে লাঠি সোটা লইয়া আসিয়া গাধাটাকে বেদম প্রহার দিল। এমন মার দিল যে গাধাটা মরিয়া গেল।

গাধাটা কি বোকা! মুখের দোষে সে যে কি, তাহা সকলকে জানাইল। লাভ হইল বেদম প্রহার, অবশেষে মৃত্যু।

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্পটি শেষ করিয়া বানর কুমীরটাকে কহিল, "তোর মনে যা' থাকুক, মুখের দোষে কিন্তু তোর মনের সব কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

যখন এই কথা হইতেছিল তখন আর একটা জলচর আসিয়া কহিল, "ওহে ভাই কুমীর, তুমি এখানে এত দেরী করিতেছ কেন? ওদিকে দেরী দেখিয়া তোমার স্ত্রী যে না খাইয়া মরিয়া গিয়াছেন!"

কুমীরের মাথায় যেন বাজ পড়িল। হাহাকার করিয়া তাহার কত কান্না, কত বিলাপ, কত অনুতাপ! সে কহিল, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ঠিক কহিয়াছেন, "যার ঘরে মা নাই, বা মিষ্ট কথা বলেন এমন স্ত্রী নাই, তার ঘর ঘর নয়, সে যেন বন। আমার ঘর আজ বন। যখন স্ত্রী মারা গেলেন, তখন এই জীবনে দরকার কি? আগুনে পুড়িয়া এখনই মরিব।"

বানর তো বানর। মকরের কান্না দেখিয়া বানরের কত বা হাসি, কত বা ঠাট্টা। সে কহিল, "সাধে কি বলিয়াছি তুমি বোকা, তুমি স্ত্রীর বশ? আজ যে তোমার বড় আনন্দের দিন, তুমি বেজার হইও না। তোমার স্ত্রী যে দুষ্ট, তার মরণে আবার কাঁদিতেছ? ছি, ছি, চুপ কর। শাস্ত্রে আছে, 'যে স্ত্রীর স্বামীর

উপর ভক্তি নাই, যে স্ত্রী ঝগড়া করে, তাহা তো স্ত্রী নয়, যেন একটি যম ।” তোমার স্ত্রী মরিয়াছে, তোমার ভালই হইয়াছে ।”

কুমীর একটু স্থির হইয়া কহিল, “ভাই, তুমি যা বলিলে, সবই ঠিক। কিন্তু আমার যে উভয় সঙ্কট! দেখ আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, তোমার মত বন্ধুর সহিত শত্রুতা হইল, অবশেষে স্ত্রী মারা গেলেন। দৈব যখন বাঁকিয়া দাঁড়ায়, তখন কি আর কারো রক্ষা আছে ? তখন তার পদে পদে বিপদ। এই বিষয়ে একটা গল্প আছে, শোন :—

শাখা গল্প ৭—

‘ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টের’ উপাখ্যান।

এক গ্রামে এক চাষা বাস করিত। তার বিত্ত-পশারও বেশ ছিল—চাষবাষে তার বেশ দু পয়সা আয় হইত। সেই চাষা একটু বেশী বয়সে বিবাহ করে। স্ত্রীটি সুন্দরী মন্দ নয়, কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল না। চাষা তো ক্রমে বুড়ো হইল। তার ছেলেপিলে তখনও কিছু হয় নাই। বুড়ো-স্বামী বলিয়া স্ত্রীর তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল না। স্বামীর সহিত সে বেশী কথা-বার্ত্তাও কহিত না।

চাষার স্ত্রীর সহিত একদিন একটা লোকের দেখা হইল। সেই লোকটা ভাল নয়,—একটা ধূর্ত্ত। সে চাষার স্ত্রীকে বুদ্ধি

দিল, "চল, আমরা দুই জনে অন্য এক দেশে পলাইয়া যাই; সেখানে আমরা সুখে থাকিব।"

চাষার স্ত্রী সেই ধূর্ত্তের কথায় মজিল। আনন্দে আটখানা হইয়া কহিল, "বা, বেশ কথা, আমি প্রস্তুত আছি। তবে আজ আর নয়, কাল সকালে যাইব। আমার স্বামীর কতকগুলি টাকা কড়ি আছে, সেইগুলি লইয়া কাল ভোরে এখানে আসিব। টাকা কড়ি লইয়া গেলে আর আমাদের কোন কষ্ট হইবে না। কেমন, একাজ কি ভাল নয়?"

ধূর্ত্ত তো টাকা কড়িই চায়। সে কহিল,—"এতো বেশ কথা, সুখের কথা। তবে এখন বাড়ী যাও, কাল ভোরে কিন্তু এখানে আসিও।" দুইজনেই বাড়ী গেল।

রাত হইল, ক্রমে দুই প্রহর। বুড়ো-চাষা ঘুমাইতেছে। তার স্ত্রীর চক্ষুতে কিন্তু আর ঘুম নাই। সে টাকা কড়ি, গহনা পত্র যাহা পাইল, সব লইয়া ভোরে পলাইল। ধূর্ত্তের সঙ্গে দেখা হইলে দুইজনেই খুব পা চালাইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল।

দুইজনে খুব চলিয়াছে। গেলও তাহারা অনেক দূর। সম্মুখে পড়িল বেশ বড় একটা নদী,—তাতে একটানা স্রোত। ধূর্ত্ত ঠকাইবার সুবিধা পাইল। সে ভাবিল, "এ কি উৎপাত সঙ্গে লইয়াছি। এমন ভারে আমার দরকার নাই। আমি চাই টাকা। তা' হইলেই হয়। আরো বিপদ, উহাকে খুঁজিতে তো লোক বাহির হইবে। যদি ধরা পড়ি রাজার কাছে রক্ষা নাই।"

ধূর্ত্তের ইচ্ছা টাকাগুলি আত্মসাৎ করা। সে স্ত্রীলোকটিকে কহিল, "এ যে দেখিতেছি, বড় একটা নদী। পার হওয়া তো বড় দায়। নৌকা তো এখন দেখি না। আগে টাকাকড়ি গহনা-পত্রগুলি তো সাম্‌লান দরকার। ওগুলি আমার কাছে দেও, আমি ওপারে রাখিয়া আসি, পরে তোমায় লইয়া যাইব।"

চাষার স্ত্রীর এদিকে তো কোন চালাকী ছিল না, সে সরল প্রাণে সম্মত হইল। ধূর্ত্ত সেই টাকা কড়ি লইয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া গেল। আর কি সে চাষার স্ত্রীর জন্য ফিরিয়া আসে? সে নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

লোকটা তো আর ফিরে না। অনেকক্ষণ গেল,—স্ত্রীলোকটি অপেক্ষায়ই বসিয়া আছে। যখন দেখিল আর ফিরিল না, তখন তার বড় ভাবনা হইল, সে মুখ কালো করিয়া নদীর তীরে কাঁদো-কাঁদো হইয়া রহিল।

এমনি কাণ্ড, তখন এক শেয়ালী এক টুক্‌রা মাংস লইয়া যাইতেছিল। নদীর তীরে হঠাৎ একটা বড় মাছ তখন ডাঙ্গায় পড়িয়া লাফাইতে লাগিল। শেয়ালী কি লোভ সাম্‌লাইতে পারে? সে মুখের মাংস মাটিতে রাখিয়া মাছটাকে ধরিতে দৌড়াইল। সাম্‌নে একটা অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাহাতে ছিল একটা শকুন বসিয়া। সে মাংস দেখিয়া তখনই ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। শেয়ালী তা দেখিল না। সে মাছের লোভে গিয়াছে, মাছ তো তাহাকে দেখিয়া আবার জলে লাফাইয়া পড়িল!

শেয়ালী ফিরিয়া দেখে মাংসও নাই। শেয়ালী তখন মাছ মাংস দুইটা হারাইয়াই হায় হায় করিতে লাগিল।

চাষার স্ত্রী ইহা দেখিয়াছিল। সে শেয়ালীকে কহিল, "বাঃ, বেশ হইয়াছে, তোমার মাংস শকুনে লইয়া গেল, মাছও জলে পড়িয়া গেল। এখন আর এদিক ওদিক চাহিলে কি হইবে ?"

শেয়ালী কি.কম সেয়ানা ? সে উত্তর করিল, "তুমি আর আমাকে কি ঠাট্টা করিতেছ ? তোমার বুদ্ধি তো আরও বেশী! স্বামী ছাড়িয়া আসিলে, তার বিস্তর টাকা কড়ি লইয়া আসিলে, তাও এক ধূর্ত্ত লইয়া পলাইল। তুমিই বা বসিয়া কি ভাবিতেছ ? তোমার মত বোকা, তোমার মত খারাপ স্ত্রীলোক আর দেখি নাই। ধূর্ত্তের হাতে পড়িয়া যে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, ভালই হইয়াছে। ইহাতে জগৎ বেশ শিক্ষা পাইবে।"

চাষার স্ত্রীর আর কথা নাই। লজ্জায়, দুঃখে, যেন তাহার মৃত্যু হইল।

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের গল্প শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে আর এক জলচর আসিয়া কহিল, "ওহে মকর, তুমি এখানে

কি করিতেছ? তোমার ঘরে যে আর এক কুমীর বাসা করিয়াছে।"

তখন কুমীর বানরকে কহিল, "দেখিলে, ভাই, দৈব আমার কেমন প্রতিকূল? আমার এমন গুণের বন্ধু শত্রু হইল, স্ত্রী মারা গেলেন, ঘর অপরে দখল করিল! আরও যে কি হইবে বলিতে পারি না। বিধাতা যার উপর বাম, তার আপদের উপর আপদ ঘটে। লোকে বলে "খোঁড়ার পা নালায় পড়ে, যার ঘরে চাউল নাই, তার ক্ষুধা বাড়ে।" কথা কিন্তু ঠিক।

কুমীর এই অবস্থায় কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বানরকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিল। শাস্ত্রেই আছে, "যে মিত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করে, তার বিপদ হয় না।" কুমীর কহিল, "মিত্র, আমার যে কেমন ভাগ্য দেখিলে তো? আমার ঘর তো আর এক কুমীরে দখল করিয়াছে। এখন আমি কি করিব বল দেখি?"

বানরের রাগ এখনও আছে, সে কহিল, "তুই বড় মূর্খ, তোকে কি উপদেশ দিব? তুই যে কাজ করিয়াছিস্, তাতে উপদেশ দেওয়া দূরে থাক্, তোর মুখ দেখিতে নাই। তুই যেমন স্ত্রীর বশ ছিলি, তোর উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। যে স্ত্রীর কথায় বন্ধুর প্রাণ লইতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলেই ভাল। যে অহঙ্কারে বন্ধুর পরামর্শ অবহেলা করে, সে গলায়-ঘণ্টা-বাঁধা উটের মত মারা যায়। শোন্, গল্পটি তবে শোন্ :—"

শাখাগল্প ৮—

গলায়-ঘণ্টা-বাঁধা উটের উপাখ্যান।

কোন গ্রামে একজন লোক ছিল,—তার নাম উদ্‌জলক। সে বড় গরীব, কায়ক্লেশে কোন মতে প্রাণ রক্ষা করে। পেশা ছিল তার রথ তৈয়ারী করা। আগে লোকে অনেক রথ তৈয়ারী করাইত,—তাতে তারও বেশ দুপয়সা রোজগার হইত। এখন কাহারও তেমন অবস্থা নয়, রথ তৈয়ার করাইবে কে? উদ্‌জলকের তো ভারি কষ্ট। এক বেলা খায় তো আর এক বেলা খায় না। সে ভাবিল, "হায়, সংসারের লোক বা কেমন, আর আমিই বা কেমন! সকলেই কাজ কর্ম্ম করে, খাটে পিটে—খায়,—আর আমি? আমার না আছে কাজ কর্ম্ম, না জোটে পয়সা। অনেকের পৈতৃক জায়গা জমি আছে, তাতেই তাদের চলে। আমার তাও নাই। বাস্তবিক আমার জন্ম বৃথা। রথকার কুলে জন্ম বটে, কিন্তু তার মত কোন কাজই করিলাম না, কেবল কষ্ট পাইয়াই গেলাম।"

নানা ভাবিয়া চিন্তিয়া উদ্‌জলকের মনে তো ভারি ঘৃণা আসিল। সে দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যাওয়াই ঠিক করিল,—ইচ্ছা সেখানে যাইয়া রোজগার করিবে।

বিদেশে চলিয়াছে,—যাইতে যাইতে উদ্‌জলক এক বনের

রাস্তা ধরিয়া চলিল। কিছু দূর গেলেই সে দেখিল একটা উটীর প্রসব বেদনা উপস্থিত। সেখানে আর কোন উট নাই, সে একলা। উটীর প্রসব হইল। উদ্‌জলক উটীকে ছানা সহিত লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তার মনে মহা আনন্দ হইল।

উদ্‌জলক উটীর জন্য নানা জায়গা হইতে ভাল ভাল ঘাস, লতা-পাতা আনিয়া দেয়। সে খাইয়া-দাইয়া বেশ মোটাসোটা হইল। উটীর ছানাটিও ক্রমে বড়সড় হইতে লাগিল।

উদ্‌জলকের আর এখন কোন কাজ নাই। সে কেবল উটীকে ঘাস খড় দেয়,—আর তার দুধ বেচিয়া বাড়ীর সকলের খোর-পোষ যোগায়। উটীর ছানাটিও বেশ বড় হইল, উদ্‌জলক তাহাকে বড় ভালবাসিত। আদর করিয়া সে তাহার গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দিল।

উদ্‌জলকের আর এখন ভাবনা নাই, উটীকে পালিতে পারিলেই তার সব খরচপত্র চলিতে পারে। এখন অন্য ব্যবসায়েও তার মন যায় না। এক দিন সে স্ত্রীকে কহিল,—"দেখ্‌লে উটের ব্যবসা কেমন উপকারী? আমি ঠিক করিয়াছি, কোন মহাজনের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার লইয়া গুর্জ্জর দেশে যাইব। সেখানে উট সস্তা, সেখান হইতে কয়েকটা উট কিনিয়া আনিব। তুমি ঘরে থাকিয়া ঘর রক্ষা করিও,—আর এই উটী ও তাহার ছানাকে যত্ন করিও। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

উদ্‌জলকের ভারি ঝোঁক্, সে টাকা লইয়া গুজরাটে গেল।

সেখান হইতে কয়েকটা উটী কিনিয়া সে বাড়ী ফিরিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার কতকগুলি উট হইল। যখন তাদের একটা দল হইল, তখন সে একজন রাখাল রাখিল। তার সহিত বন্দোবস্ত হইল—সে বৎসর বৎসর এক একটা উটের ছানা পাইবে, সম্বৎসর আর কোন মাহিয়ানা পাইবে না।

উটের ব্যবসা করিয়া উদ্‌জলকের আর দুঃখ কষ্ট নাই। তার এখন বেশ আয়। উটেরা দল বাঁধিয়া সকালে মাঠে চরিতে যাইত, আর যেই সন্ধ্যা হইত, অমনি বাড়ী ফিরিয়া আসিত। রোজই উটগুলি দল বাঁধিয়া চরিতে যায় আর ফিরিয়া আসে। একদিন এই হইল, প্রথম উটীর ছানাটি পিছনে পড়িল, সে আর দলে মিশিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিল না। তার অহঙ্কার কে তাহাকে ধরিবে। তার গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধা ছিল। সে যখন চলিতে লাগিল, ঘণ্টাও তখন বাজিতে লাগিল। অন্যান্য উটেরা কহিল, 'এ বেটা বড় বোকা। একে তো দল ছাড়া হইল, তাহাতে গলায় ঘণ্টা,—না জানি আজ কি বিপদ ঘটে।'

উটের দল বনের পথ দিয়া বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। ঘণ্টা-বাঁধা উট অনেক দূর পিছনে আসিতেছে। ঘণ্টার আওয়াজ শুনিল এক সিংহ। সে তখনই উহাকে ধরিতে লুকাইয়া রহিল। উটের দল কিন্তু নিরাপদে বাড়ী ফিরিল।

ঘণ্টাবাঁধা উট অনেক পিছনে পড়িয়াছিল। সে আর বনের মধ্যে রাস্তা দেখিতে পাইল না। তার তখন মহা চীৎকার

আরম্ভ হইল। সিংহ সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল দেখিতে দেখিতে উটের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

* * *

প্রধান গল্পারম্ভ—

এই গল্প শেষ করিয়া বানর কহিল, "তাই বলিতেছিলাম, যে অহঙ্কারে সাধুর কথা, মিত্রের কথা না শোনে, তার দশা এই উটের মতই হয়।"

কুমীর কহিল, "তার জন্যই তোমাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি। শাস্ত্রে আছে, 'যে পরের উপকারে সৎ পরামর্শ দেয়, তার ইহকালেও সুখ হয়, পরকালেও স্বর্গলাভ হয়।' তোমার কাছে তো আমার অপরাধ হইয়াছেই। এখন একটা সৎ পরামর্শ দাও। অপকারীর উপকার করাটা অধিকতর মহত্ত্ব নয় কি ? অসময়ে শত্রুরও উপকার করিতে হয়।"

বানর কহিল, 'আমার মতে সেই কুমীরের সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। তাতে দুই ফল,—এক ফল, যুদ্ধে জিতিলে নিজের ঘর পাইবে, বীর বলিয়া সম্মান পাইবে, আর দ্বিতীয় ফল,—যদি মরিয়াই যাও, তবে স্বর্গলাভ করিবে। শাস্ত্রেও আছে, 'সমতুল্যের সহিত যুদ্ধই করিতে হয়।' এই বিষয়ে এক গল্প কহিতেছি, শোন :—

শাখাগল্প ৯—

চালাক শেয়াল আর মরা হাতীর উপাখ্যান।

এক বনে একটা শেয়াল থাকিত,—তার নাম মহাচতুর। সে একদিন বনে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল, একটা মরা হাতী পড়িয়া আছে। খুব পেট ভরিয়া মাংস খাইতে পাইবে ভাবিয়া শেয়ালের আজ বড় আনন্দ। সে মড়াটার চারিদিক দেখিতে লাগিল। কত চেষ্টা করিল, কত কামড়াইল, কিছুতেই সে হাতীর মোটা চামড়া ছিঁড়িতে পারিল না। শেয়ালের মাংস খাওয়া কষ্টকর হইল।

দৈবের ঘটনা, সেখানে একটা সিংহ আসিয়া উপস্থিত। শেয়াল সিংহকে দেখিয়া মাটিতে পড়িয়া এক নমস্কার করিল। অবশেষে কহিল, "প্রভু, আপনার জন্যই এই ভৃত্য এই মরা হাতীর পাহারা দিতেছে। আপনি এখন ইহাকে খান্।"

সিংহ কহিল, "জান তো অন্যের মারা জন্তু আমি খাই না। বড় ক্ষুধা লাগিলেও ঘাস খাইব না। সদ্বংশে যাঁর জন্ম, বিপদে পড়িলেও তিনি রীতি-নীতি ত্যাগ করেন না। আমি খাইব না, তুমি স্বচ্ছন্দে এই মরা হাতীর মাংস খাও।"

শেয়াল কহিল, "এই দয়া রাজার উপযুক্তই হইয়াছে। শাস্ত্রেও আছে, যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা মহত্ত্ব ছাড়িতে পারেন না।"

সিংহ সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। একটু পরে আবার সেখানে এক বাঘ আসিয়া হাজির। শেয়াল বড় অস্থির হইল। সে ভাবিল, "এ আবার কি উৎপাত, বাবা! এ বেটাকে এখন বিদায় করি কি করিয়া? যা হউক, একটা চালাকী করা যাক্।'

শেয়াল বাঘের কাছে আসিয়া কহিল, "এ কি মামা, এখানে কেন? এই যে সিংহ হাতীটাকে মারিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'যদি কোন বাঘ আসে, তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর দিবে। আমি এই বনের সব বাঘ মারিয়া ফেলিব।"

এই কথা শুনিয়া বাঘ কি আর থাকে? সে পলাইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "ভাগ্‌নে, সিংহকে আমার কথা বলিও না, আমার মাথা খাও।"

বাঘ তো পলাইল। এমন সময় একটা চিতাবাঘ তো আসিয়া আবার উপস্থিত হইল। শেয়াল ভাবিল, "ভালই হইল, ইহার দাঁতগুলি বড় ধারাল। ইহা দ্বারা হাতীর চামড়াটা ছিঁড়াইয়া লইতে হইবে।"

শেয়াল চিতাবাঘকে কহিল, "কি ভাগ্‌নে, এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার মুখ যে শুক্‌নো। ভাবে বুঝি তুমি কিছু খাও নাই। এই বেলা কিছু খাও। সিংহ হাতীটাকে মারিয়া রাখিয়া স্নানে গিয়াছেন। আমি আছি পাহারায়। সিংহ আসিতে না আসিতে কিছুটা খাইয়া যাও।"

চিতাবাঘ উত্তর করিল, "না মামা, ও কাজে দরকার নাই। প্রাণে বাঁচিলে সব পাইব। সিংহ জানিলে কি আর রক্ষা রাখিবে? শাস্ত্রে আছে, 'কেবল খাইলে হয় না, হজম করা চাই।' বদহজমি জিনিসে প্রাণ যায়। আমি, মামা, ও মাংস হজম করিতে পারিব না, আমি পলাই।"

শেয়াল বড় দুষ্ট, সে কহিল, "বাছা, অত ভয় কর কেন? তুমি খাও না,—আমি দেখিতেছি সিংহ আসে কি না। তাহাকে আসিতে দেখিলেই তোমাকে বলিব।"

শেয়াল একটু দূরে যাইয়া দাঁড়াইল। কিছু সময় গেল। শেয়াল মনে করিল, "হয় ত এতক্ষণ চিতাবাঘ হাতীর চামড়া ছিঁড়িতে পারিয়াছে।" সে তখন চীৎকার করিয়া কহিল, "পলাও, পলাও, সিংহ আসিতেছে।"

চিতাবাঘ শুনিয়া ভয়ে পলাইল। শেয়ালের হইল মহা পোয়াবারো। সে সেই ছেঁড়া অংশ হইতে মাংস তুলিয়া মনের সুখে খাইতে লাগিল।

যখন শেয়ালের কতকটা মাংস খাওয়া হইয়াছে, তখন আর একটা শেয়াল রাগে ফুলিয়া আসিয়া উপস্থিত। প্রথম শেয়ালটা ভাবিল, "এ বেটাকে তো তাড়ান সোজা নয়? ও তো আমার মত ক্ষমতা রাখে। ওকে যুদ্ধ করিয়া হারাইব। সমকক্ষের সহিত যুদ্ধ করাই নীতি।"

যখন দ্বিতীয় শেয়ালটা আসিল, তখন প্রথম শেয়াল তাহাকে

আক্রমণ করিল। দুইজনে খুব যুদ্ধ হইল। অবশেষে দ্বিতীয়টা হারিয়া মরিয়া গেল। প্রথম শেয়ালের হইল মহা আনন্দ,—সে বহুদিন সেই হাতীর মাংস খাইয়া সুখী হইল।"

*　　*　　*　　*

প্রধান গল্পারম্ভ—

গল্পটি শেষ হইলে বানর কুমীরকে কহিল, "কুমীর, তোমার শত্রু যে তোমার একজাতীয়। তাহার সহিত কি যুদ্ধ করিতে পারিবে না ? যাও, যাও, এখনই যাইয়া যুদ্ধ কর। যদি অনেক দিন সে সেখানে থাকে, তবে তাকে তাড়ান দুষ্কর হইবে। ইহাতে তোমার প্রাণও যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা কহেন, "স্বজাতীয় হইতেই অধিক আশঙ্কা।" স্বজাতীয়ের অত্যাচার যে কি বিষম—এক গল্পে তাহা কহিতেছি ঃ—

শাখা গল্প ১০—

কুকুর চিত্রাঙ্গের উপাখ্যান।

কোন দেশে একটা কুকুর ছিল, তার নাম চিত্রাঙ্গ। কুকুরটা ছিল বেশ, কিন্তু দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হইল, তখন তার বড় দুর্দ্দশা হইল। সে খাইতে পায় না,—যেখানে যায়, সেখানেই প্রহার খায়। ভাতের অভাবে তাহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইল।

বড় নিরুপায়,—কুকুরটার প্রাণ যায়-যায়। সে অন্য কোন

উপায় না দেখিয়া আর এক দেশে গমন করিল। সেখানে সে এক গৃহস্থের বাড়ীতে চুপ করিয়া ঘরে ঢুকিত, আর যাহা পাইত তা-ই খাইয়া আসিত। কিন্তু সেই বাড়ীর বাহির হইলেই, আর আর কুকুরেরা অমনি তাহাকে খুব কামড়াইয়া দিত।

কুকুর চিত্রাঙ্গের আর সহ্য হয় না। রোজ রোজ কি এমন কামড়ানি সহিতে পারা যায়? সে ভাবিল, "আমি আর এদেশে থাকিব না, দেশেই যাইব। যদি খাইতে না পাইয়া মরি, তবুও ভাল।" কুকুরতো দেশে ফিরিয়া গেল। তখন পরিচিত কুকু-রেরা জিজ্ঞাসা করিল, "বিদেশে কেমন ছিলে, ভাই?"

চিত্রাঙ্গ উত্তর করিল, "বিদেশের কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। সেখানে আহারের অভাব নাই সত্য, কিন্তু সেখানকার কুকুরেরা আমায় দেখিতে পারিত না। তারা বড় কামড়াইত। বলিতে কি, যদি দেশে কষ্ট পাই, তবুও ভাল। কেউ যেন কখন বিদেশে না যায়।"

*　　　*　　　*

প্রধান গল্পারম্ভ—

এই উপদেশ শুনিয়া কুমীর বানরের নিকট বিদায় লইয়া দেশে গেল। সে অপর কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। কুমীর সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

অপরীক্ষিত-করণ বা দুঃসাহসিকতা।

বিষ্ণুশর্ম্মা পূর্ব্ব অধ্যায়ের গল্পগুলি শেষ করিয়া রাজকুমার-দিগকে কহিলেন, "রাজকুমারগণ, সংসারের লোকে ভালটাই চায়। যেটা দেখিতে ভাল নয়, শুনিতে ভাল নয়, কার্য্যে ভাল নয়, বিষয়ে ভাল নয়, তাহাতে মন দিতে নাই। সকল বিষয়েই পরীক্ষা আবশ্যক। তাহা না করিলে মহা বিপদে পড়িতে হয়। এই বিষয়ে এক গল্প কহিতেছি, শোন :—

প্রধান গল্প—শ্রেষ্ঠী ও নাপিতের উপাখ্যান।

এ দেশে এক নগর আছে, নাম পাটলীপুত্র। সেখানে এক শেঠী বাস করিতেন—তাঁর নাম মণিভদ্র। তিনি ছিলেন বড় ধাৰ্ম্মিক, বড় উদার। পয়সাও তাঁর বিস্তর ছিল, কিন্তু নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম; দান ধ্যানে সব শেষ হইয়া গেল। মণিভদ্র হইলেন

এখন বড় গরীব—বড় কষ্টে তাঁর দিন যায়। দেনাপত্রও বিস্তর ছিল, এখন যে-সে পাওনাদারও তাঁকে অপমান করে। তাঁর দুঃখের আর সীমা নাই,—তিনি আধমরার মত এক রকম আছেন।

রাত্রি হইয়াছে। মণিভদ্র বিছানায় শুইয়া আছেন, কিন্তু চ'খে ঘুম নাই। অত কষ্টে কি আর ঘুম হয়? তিনি বিছানায় পড়িয়া কত কি ভাবেন, আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন। ভাবনা, "হায়, অর্থ না থাকিলে কি কষ্ট! যার অর্থ নাই, টাকা কড়ি নাই,—তার জীবনে ধিক, তার মরণই মঙ্গল। শাস্ত্রকারেরা ঠিক বলিয়াছেন, "যার টাকা কড়ি নাই; তার যদি স্বভাব খুব ভালও হয়, আচার ব্যবহার ভালও হয়, তার দয়া মায়াও থাকে, দান ক্ষমাও থাকে, সে যদি কুলীনের ছেলেও হয়, তবু তার শোভা থাকে না। অর্থ না থাকিলে পণ্ডিতের মান অভিমান লোপ পায়, জ্ঞান, বুদ্ধি, চতুরতা সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" যার কাঁধে পরিবার প্রতিপালনের ভার, সে গরীব হইলে তার কি বুদ্ধি ঠিক থাকে? মহা বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি গুলিয়া যায়। অর্থ না থাকিলে জীবন বৃথা, অর্থহীনের মরণই মঙ্গল।"

শেঠজি এই রকম কত কি ভাবিতে লাগিলেন। যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই তাঁর ভাবনা বাড়িয়া উঠিল। তিনি ঠিক করিলেন আর বাঁচিয়া লাভ নাই, মরিতেই হইবে। বেশী ভাবনায় বেশ ঘুম পায়। শেঠজি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত যখন প্রায় দুপুর, তখন শেঠজি এক স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্বয়ং বিষ্ণু জৈন সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিতেছেন, "শেঠজি,তুমি অমন বৈরাগ্য ধরিলে কেন ? আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের সেই পদ্মনিধি। আজ এই সন্ন্যাসীর বেশে তোমার কাছে আসিয়াছি। কাল ভোরে এই বেশেই তোমার কাছে যাইব। আমাকে দেখিলেই তুমি আমার মাথায় এক লাঠির ঘা মারিও। আমি তখনই মরিব আর তখনই অক্ষয়নিধি হইয়া তোমার ঘরে থাকিব, তোমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হইবে।"

রাত যতই গভীর হইতে লাগিল, স্বপ্নও শেঠজি অনেক দেখিতে লাগিলেন। রাত ভোর হইল, তিনি উঠিলেন। রাত্রির স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি ভাবিলেন,"আমি দিন রাত কেবল 'অর্থ, অর্থ' ভাবি, তাই এই রকমের কত দুঃস্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন কি আর সত্য হয় ? শাস্ত্রেও বলে, যারা শোকাতুর, যারা চিন্তাগ্রস্ত, যারা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, যারা ভোগবিলাসী তারাই এই রকমের স্বপ্ন দেখে।"

শেঠজি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখনই তাঁহাকে এক ঘা লাঠি মারিলেন। কি আশ্চর্য্য, মানুষটা অমনি একটা সোণার কলসি হইল, তাহাতে কত মণি মাণিক্য! শেঠজির কি আর দেরী সয় ? তিনি মহা আনন্দে সেই সোণার কলসি তাড়াতাড়ি ঘরে লইয়া গেলেন।

দৈবের ঘটনা, এক নাপিত তখনই শেঠজিকে কামাইতে আসিয়াছিল। সে এই ঘটনা দেখিয়া আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কলসি রাখিয়া যখন শেঠজি বাহির হইলেন, সম্মুখে দেখিলেন নাপিত দাঁড়াইয়া। তিনি ভাবিলেন 'ব্যাপার তোসবই নাপিত বেটা দেখিল, সে হয়ত এখনই সকলকে এই কথা বলিবে। কথাটা শেষে হয়ত রাজার কাণে উঠিবে।' শেঠজি ভয় পাইলেন, তিনি নাপিতকে বিস্তর টাকা কড়ি দিয়া সুখী করিয়া বিদায় করিলেন। বিশেষ সাবধানও করিয়া দিলেন সে যেন একথা কাহাকেও না বলে। নাপিতও বলিল একথা সে কাহাকে বলিবে না।

নাপিত কামাইয়া ঘরে ফিরিল, কিন্তু সেই সোণার কলসির কথা তার মন হইতে আর দূর হইল না। সে ভাবিল, "সন্ন্যাসী মারিলেই তো সোণার কলসি পাওয়া যায়। তবে আমি এমন করি না কেন? সোণার কলসি পাইলে আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকিবে না। কালই আমি জৈন সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া আমার বাড়ী আনিব, আর এক এক জনকে এক এক লাঠির ঘায়ে মারিয়া বিস্তর সোণার কলসি লাভ করিব।"

এই চিন্তায়তো নাপিত ভারি ব্যাকুল। সে যেন অতি কষ্টে সময় কাটাইতে লাগিল। অনিদ্রায় সে রাত ভোর করিল।

উঠিয়াই সে মঠে যাইয়া সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিল। নিমন্ত্রণের আবার ভঙ্গী কি—দাঁতে কুটা, গলায় কাপড়, যোড় হাত, আবার তিন তিনবার তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ।

নাপিততো তাদের কত স্তবস্তুতি করিল, কত খোসামুদীর কথায় বিনয় দেখাইল। শেষে নিমন্ত্রণের কথাটা পাকা করিতে সে প্রধান সন্ন্যাসীর পায়ে পড়িয়া কত কি বলিল। সন্ন্যাসীরা বলিলেন, "তোমার এ সব কথা কি ?"

নাপিত কহিল,"আজ আপনাদিগকে আমার বাড়ী যাইতেই হইবে। আমি যে সামান্য আহারের যোগাড় করিয়াছি, তাহা পবিত্র করিয়া আসিতেই হইবে।"

প্রধান সন্ন্যাসী কহিলেন, "নিমন্ত্রণ করিলে আমরা কোথাও যাই না। আমরা যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াই। ভাল ধার্ম্মিক লোক দেখিলেই তাঁহার বাড়ী যাই। গৃহস্থ খুব পীড়া-পীড়ি করিলে কেবল দেহ রক্ষার আবশ্যক মত আহার করি। তুমি আমাদের নিমন্ত্রণের কথা আর বলিও না।"

নাপিত বড় চতুর, বড় ধূর্ত্ত। সে কহিল "আমি তো নিমন্ত্রণ করিতে আসি নাই, আমি কি আর আপনাদের নিয়ম জানি না ? জৈনধর্ম্মের বই লেখাইতে আমি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি,—আপনারা গেলেই সেগুলি দিতে পারি। বই বাঁধিতে কত সুন্দর ও মূল্যবান কাপড় কিনিয়া রাখিয়াছি। আপনারা না গেলে সেগুলি বৃথায় যায়।"

সন্ন্যাসীরা বড় সরল, তাঁরা নাপিতের ধূর্ত্ততা বুঝিলেন না। কোন সন্দেহ না করিয়া তাঁহারা নাপিতের বাড়ী যাইতে স্বীকার করিলেন। নাপিতের মহা আনন্দ উপস্থিত হইল।

নাপিত বাড়ী আসিল। লাঠির ঘায়ে তো সন্ন্যাসীদিগকে মারিতে হইবে, সে খয়ের কাঠের এক লাঠি তৈয়ার করিয়া কপাটের এক কোণে লুকাইয়া রাখিল।

বেলা প্রায় দেড় প্রহর, তখনও সন্ন্যাসীরা আসিলেন না। নাপিতের আর দেরী সয় না,—সে দৌড়িয়া আবার মাঠের কাছে গেল। তাহাকে আবার আসিতে দেখিয়া সন্ন্যাসীরা বাহির হইলেন। নাপিত আহ্লাদে তাঁহাদিগকে বাড়ী লইয়া গেল।

এই মঠের সন্ন্যাসীরা ধনের লোভ পাইয়াছে,—তাঁদের তো ভারি আনন্দ। তাঁরা নিকটের অন্য কোন মঠের সন্ন্যাসীদিগকে পর্য্যন্ত এই খবর জানাইলেন না। লোভের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাঁরা বাড়ী ঘর ছাড়িয়াছেন, সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন, সুখভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, প্রায় নেংটা থাকেন, হাতে জল খান্, অতি কষ্টে দিন রাত কাটান, তাঁরাও অর্থের মায়া কাটাইতে পারেন না! লোকে বুড়ো হয়, তার চুল পাকে, দাঁত পড়ে, চক্ষুর জ্যোতি যায়, আর সকল ইন্দ্রিয়ের জোর কমে, কিন্তু তার পাপবাসনা আর কমে না,—ধনের তৃষ্ণা আর কমে না! মরণ দশায় পড়িলেও লোকের বাসনা যেমন তেমনই থাকে!

নাপিত সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া তো বাড়ী ফিরিল। সে সকলকে এক ঘরে বন্ধ করিয়া সেই খয়ের কাঠের লাঠি দিয়া তাঁদের মাথায় ঘা মারিতে লাগিল। সে কি বিষম ঘা,—অনেক সন্ন্যাসী মরিয়া গেলেন, কাঁহারো মাথা ফাটিল, কাঁহারো হাড় ভাঙ্গিল, কাঁহারো

পাঁজর ভাঙ্গিল। যাঁরা মরেন নাই, তাঁরা 'মলেম রে, গেলাম রে' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁদের চেঁচানি শোনে কে? নাপিত বেদম মার মারিতেছে।

চেঁচানি শুনিয়া বিস্তর লোক জড় হইল,—অনেকে নাপিতের বাড়ী যাইয়া ঘরের দরজা খুলিতে চেষ্টা করিল। প্রহরীরা রাজপথে ছিল, তাহারা নাপিতের বাড়ী দৌড়িল। আবার চীৎকার উঠিল 'রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রাণ যায়।' যে সকল সন্ন্যাসী কোন রকমে দ্বারের বাহির হইতে পারিলেন, তাঁহারা সকলকে আসল কথা জানাইলেন। আহা, তাঁদের কি দুর্দ্দশা! কারো মাথা ফাটিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে, কারো নাকমুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কারো হাত পা ভাঙ্গা, তাঁদের শরীর যেন রক্তগঙ্গা!

প্রহরীরা শুনিয়া তখনই নাপিতকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এমন কুকর্ম্ম করিলি কেন?"

নাপিত ভয়ে উত্তর করিল,—"মহারাজ, আমার অপরাধ নাই। অমুক গ্রামের মণিভদ্র শেঠের এই ব্যাপার দেখিয়াছিলাম।" নাপিত রাজাকে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। রাজা তখনি লোক পাঠাইয়া মণিভদ্রকে ডাকাইলেন। মণিভদ্র রাজাকে আগাগোড়া সকল কথা শুনাইলেন। সন্ন্যাসীরা দলে দলে রাজসভায় উপস্থিত,—সকলে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ বেটা নাপিতকে এখনি শূলে চড়াইয়া দিন।"

রাজা নাপিতকে শূলের আদেশ করিলেন। তাহাকে শূলে চড়াইলে সন্ন্যাসীরা মণিভদ্রকে কহিলেন,—"বাবা,সকল কাজেই পরীক্ষা আবশ্যক। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কাজ না করিলে বড় বিপদ, বড় কষ্ট, বড় অনুতাপ ঘটে। এই বিষয়ে এক গল্প কহিতেছি, শোন ঃ—

শাখা গল্প ১—

এক ব্রাহ্মণী ও নেউলের উপাখ্যান।

কোন এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—তাঁর নাম দেবশর্ম্মা। তিনি বড় গরীব, সংসারে তাঁর আর কেউ নাই, কেবল এক স্ত্রী। কালে ব্রাহ্মণের এক ছেলে হয়। ছেলেটী বড় আদরের—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, সর্ব্বদা কোলে কাঁকে রাখেন।

ব্রাহ্মণের একটা বেজী ছিল,—তিনি সেইটাকে বড় ভাল বাসিতেন, আদর করিতেন। বেজীটাও আদর পাইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বড় বাধা হইয়াছিল, সে তাঁদের পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। বেজীটা রোজ রোজই বেশ বড় হইতে লাগিল।

বেজীটার জন্য ব্রাহ্মণীর বড় ভয় ছিল। ভয়,—পাছে ছেলেকে কামড়াইয়া বা আঁচড়াইয়া মারে। তিনি সর্ব্বদা বেজীটার উপর নজর রাখিতেন। বেজীর স্বভাব বড় খল।

তাহাকে ব্রাহ্মণী বিশ্বাস করিবেন কি প্রকারে ? "কি জানি কখন কি করে" ভয়ে ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন।

বেজীটা কিন্তু ছেলেটিকে কিছু বলিত না। সে তাহার আশে পাশে ঘুরিত, খেলা করিত, তাহার বিছানায় শুইতে যাইত। ছেলেটি যদি কখনো হাত পা ছুড়িত, বেজী কিছু বলিত না। সে অনেক সময় প্রহরীর কাজ করিত,—তার জন্য বিড়াল, কুকুর, শেয়াল, কাক ঘরে ঢুকিতে পারিত না। সে প্রায়ই ছেলেটির বিছানার পাশে পড়িয়া থাকিত।

এক দিন শিশু ঘুমাইয়াছে,—ব্রাহ্মণ নিকটে বসিয়া, বেজীটা ঘরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণীর জল আনার দরকার। তিনি কাঁকে কলসী লইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "আমি জল আনিতে চলিলাম, খোকাকে দেখিও, বেজী সাবধান। আমি না আসা পর্য্যন্ত ঘর হইতে বাহিরে যাইও না।"

ব্রাহ্মণী জল আনিতে গেলেন। ঘাটে জানা শুনা লোক ছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্রাহ্মণীর আসিতে দেরী হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, ভিক্ষা করিয়া খান। বেলা অধিক হইতেছে, বেশী বেলা হইলে ভিক্ষা মিলিবে না ভাবিয়া তিনি ঝুলী লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাঁহার মনে কিন্তু ধারণা, —'ব্রাহ্মণীতো এখনই আসিবেন, একটু দেরীতে আর কি ক্ষতি হইবে।' ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

ব্রাহ্মণীর আসিতে বেশ একটু দেরী হইল। খোকাটী তখনও

ঘুমাইয়া আছে। দৈবের ঘটনা, কি জানি কি করিয়া একটা সাপ সেই ঘরে ঢুকিল। সে সোজাসুজি একেবারে খোকার বিছানার প্রায় কাছে যাইয়া উপস্থিত,—আর একটু হইলেই শিশুকে কামড়াইতে পারে। বেজী বড় সতর্ক, সে তখন একটু দূরে ছিল। সে দূর হইতে সাপটাকে দেখিয়াই দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিল। দুইজনে খুব ঝুটোপটি,—খুব যুদ্ধ হইল। সাপ কখনো বেজীর সঙ্গে লড়াইয়ে পারে না। বেজী সাপকে কামড়াইতে কামড়াইতে মারিয়া ফেলিল। সাপের রক্তে বেজীর হাত পা ভাসিল,—তার দাঁত মুখে রক্ত লাগিয়া রহিল। সে ঘন ঘন সেই রক্ত জিভ দিয়া চাটিতে লাগিল। শিশুকে রক্ষা করিয়াছে,—বেজীর বড় আনন্দ। সে একবার খোকার কাছে যায়, আবার বাহির হইয়া দেখে ব্রাহ্মণী আসিতেছেন কি না।

এই সময়ে ব্রাহ্মণী জলের কলসি কাঁকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। সাপটাকে মারিয়া বেজী বড়ই খুসী, বড়ই তাহার আনন্দ। সে তাহার মুখের রক্ত চাটিতে চাটিতে ব্রাহ্মণীর কাছে উপস্থিত হইল। সে কত খেলিতে লাগিল, কত লাফাইতে লাগিল, তার ইচ্ছা মাকে আনন্দ দেখান। সে বড় আহ্লাদে কতবার মার পায়ের কাছে গড়াগড়ি দেয়, কতবার বা তাহার পায়ে লাফাইয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণী তো কিছু জানেন না, তিনি দেখিলেন বেজীর মুখে রক্ত, সেই রক্ত জিভ দিয়া চাটিতেছে। তাঁহার বড় ভয় হইল। তিনি মনে করিলেন, বেজী খোকাকে নিশ্চয় কামড়াইয়া মারি-

য়াছে, তাহার মুখের রক্ত খোকার রক্ত। ব্রাহ্মণী কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি শোকে আকুল হইয়া, 'খোকারে, খোকারে, তুই কোথা গেলিরে' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। পুত্রশোকের বিলাপ আর কান্না তো বড় সহজ নয়? বেজী তখনও ব্রাহ্মণীর পায়ের কাছে আসিয়া লোটাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণীর বড় রাগ হইল। তিনি বলিলেন, 'আমি তোরে এখনই মারিয়া ফেলিব,' এই বলিয়া তিনি জলভরা কলসি বেজীর মাথার উপর ফেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বেজীর আনন্দ কোথায় চলিয়া গেল। সে মায়ের পায়ের কাছে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

ব্রাহ্মণী বড়ই ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে কত গালাগালি দিলেন। কিন্তু একি? খোকা যে ঘুমে,—যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে! তাহার শরীরে একটী আঁচড়ও লাগে নাই। তখন ব্রাহ্মণীর চোখ নীচের দিকে পড়িল,—তিনি শিহরিয়া সরিয়া আসিলেন। সর্ব্বনাশ, একটা বিষাক্ত সাপ যে মরা,—কে জানি কামড়াইয়া তাহাকে মারিয়াছে। তার রক্তে ঘরের মেজ ভাসিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণী অবাক্—তাঁর মুখে কথা নাই,—তিনি ভাবিলেন, 'আর একটু হইলেই তো খোকাকে কামড়াইয়া মারিত। ঈশ্বর বড় রক্ষা করিয়াছেন!'

ব্রাহ্মণীর তখনই জ্ঞান আসিল,—তিনি সব কাণ্ড বুঝিতে

পারিলেন। তিনি তখনই বুঝিলেন, 'বেজী সাপটাকে কামড়াইয়া মারিয়াছে, তা' না হইলে, সাপ খোকাকে খাইয়া ফেলিত।' ব্রাহ্মণীর শোক গেল, বিস্ময় গেল,—এখন অনুতাপ আসিল। তিনি বেজীর জন্য 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। তিনি বেজীকে ছেলের মত আদর করিতেন, ভালবাসিতেন। সেই বেজীকে তিনি নিজ হাতে মারিয়া ফেলিলেন, তাঁহার কত দুঃখ। তিনি কত কাঁদিলেন, কত বিলাপ করিলেন। কাঁদিলে, বিলাপ করিলে কি এই দুঃখ যায়? যখন তিনি ভাবেন বেজী তার খোকাকে রক্ষা করিয়াছে, তখনই তিনি বড় অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁর বুক ফাটিয়া যায়। ব্রাহ্মণী বেজীর শোকে পড়িয়া রহিলেন।

বেলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া চাউল লইয়া বাড়ী আসিলেন। তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণী শোকে আত্মহারা, মাথা ও বুক চাপড়াইতেছেন আর কাঁদিতেছেন। ব্রাহ্মণতো অবাক্। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, এমন করিতেছ কেন? খোকা ভাল আছে তো?"

ব্রাহ্মণী রাগিয়া কহিলেন, "হাঁ, খোকা তো ভাল আছে, ঈশ্বর বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আপনার এত লোভ? আমার কথাটা গ্রাহ্য না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন? আপনার লোভে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—আমাদের সাধের বেজী আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বাবা রে, কোথা গেলি রে।"

ব্রাহ্মণ বেজীর মৃত্যু শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

যখন ব্রাহ্মণী সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন, তখন ব্রাহ্মণের দুঃখ রাখিবার আর স্থান রহিল না। ব্রাহ্মণী কহিলেন, "অতি লোভে এই দশাই ঘটে। শাস্ত্রেও আছে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' অতি লোভীর মাথায় চক্র ঘোরে। গল্পটী কি জানেন না? তবে কহিতেছি, শুনুন :—

শাখা গল্প ২—

অতি লোভীর মাথায় চক্র ঘোরে তার উপাখ্যান।

এক গ্রামে চারি জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁরা সমবয়সী, এক রকম স্বভাবের, বন্ধুত্বও তাঁদের মধ্যে খুব ছিল। কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন। তখন তাঁদের মনে ভারি সুখ, ভারি স্ফূর্ত্তি। সংসারের দুর্ভাবনা না থাকিলে সকলেরই মনে আনন্দ থাকে। এইরূপ ভাবে তাঁদের কিছু কাল কাটিয়া গেল।

সুখতো আর চিরকাল কারো সমান থাকে না, কারো দিন সমান যায় না। ব্রাহ্মণদের কপাল ভাঙ্গিল,—দৈবক্রমে তাঁহারা দরিদ্র হইলেন। তাঁহাদের টাকা কড়ি সব গেল। অতি দুঃখ কষ্টে তাঁহাদের দিন গুজরায়। এমন কষ্ট হইতে লাগিল, এক বেলা তাঁদের খাওয়া জোটে তো, আর এক বেলা জোটে না।

একদিন চারি বন্ধুই এক জায়গায় মিলিলেন। আজ তাঁহারা

পরামর্শ করিবেন, তাঁহাদের কি করা উচিত। এক বন্ধু কহিলেন, "আমাদের যে অবস্থা, তাতে আর দুঃখ কষ্ট তো সহ্য হয় না। এখন হাতে টাকা কড়ি নাই, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলে ঘৃণা করে, ঠাট্টা করে, আমাদিগকে দেখিয়া দূরে সরিয়া যায়। এখন সমাজে বাস করাও কঠিন। লোকে বা কেমন থাকে, কেমন চলে, আর আমাদের কি অবস্থা! এই অবস্থা যেন মৃত্যু-যাতনা! শাস্ত্রকারেরা ঠিকই কহিয়াছেন, "যার টাকা কড়ি নাই, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে, ত্যাগ করে। হাজার তাহার গুণ থাকুক, তার যে অর্থ নাই, টাকা কড়ি নাই, তাহাতে তাহার সমস্ত গুণ লোপ পায়। অধিক কি, স্ত্রীপুত্র ঘৃণা করে, গালিমন্দ দেয়। তখন আপদই তার সম্বল হয়।" আমাদের যে অবস্থা তাতে তো আর স্থির থাকা যায় না। এখন কিসে টাকা হয়, তার একটা উপায় করা উচিত।"

আর তিন বন্ধু বলিলেন, "খুব ঠিক কথা। আর এই অবস্থায় মুখ দেখাইব না। চল, টাকা রোজগারের ফিকিরে যাওয়া যাক্। টাকা হইলে আমরা দেশে ফিরিব, তা না হইলে সকলেই বিদেশে মরিব।"

চারি বন্ধু বিদেশে বাহির হইলেন। অর্থের টান,—পরিবার, পুত্র-কন্যা, বাড়ীঘর, আত্মীয় স্বজন সব পড়িয়া রহিল। তাহা-দিগকে ছাড়িতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হইল না। নীতিজ্ঞেরা ঠিক কহিয়াছেন, "টাকা টাকাই যাদের মন, তাহারা পৃথিবীর

সকল বস্তু ছাড়িতে পারে, কোন মায়া তাহাদিগকে আটুকাইয়া রাখিতে পারে না। তাদের মায়া কেবল টাকার উপর। যেরূপে হউক,টাকা পাইলেই তাহারা সুখী। টাকা রোজগারে তাঁদের ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না।”

চারি বন্ধু চলিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর তাঁহারা অবন্তী নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে চিত্রা নদীতে স্নান করিয়া তর্পণ করিলেন, মহাকাল মন্দিরে যাইয়া মহাদেব দর্শন করিলেন। যখন মন্দির হইতে বাহির হইলেন, পথে তাঁহাদের গুরু ভৈরবানন্দ যোগীন্দ্রের সহিত দেখা হইল। শিষ্যেরা গুরুকে প্রণাম করিলেন।

যোগীন্দ্র শিষ্যদিগকে লইয়া মঠে গেলেন। অনেক কথা-বার্ত্তার পর তিনি শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তোমরা কোথায়, কেন যাইতেছ?”

শিষ্যেরা উত্তর করিলেন, “আমরা মানত করিয়া বাহির হইয়াছি। যদি ইচ্ছা পূর্ণ হয় তবেই দেশে ফিরিব, নচেৎ আর ফিরিব না। আমাদের যে দুঃখ কষ্ট, তাহা আর সহ্য হয় না। ‘হয় ধন, নয় মরণ’ পণ করিয়াছি। যে পর্য্যন্ত এই দুইয়ের একটা না মিলিবে, সেই পর্য্যন্ত আমরা পথই চলিব। আমাদের সৌভাগ্য, পথে গুরুদর্শন হইল। আপনি সিদ্ধপুরুষ, যদি অর্থ লাভের কোন উপায় থাকে বলিয়া দিন, আমরা সকল কার্য্যই করিতে প্রস্তুত।”

যোগীন্দ্র দেখিলেন শিষ্যেরা দেশে ফিরিবে না। তিনি কোনও বাধা না দিয়া চারিজনের হাতে চারিটি সিদ্ধ বাতি জ্বালিয়া দিলেন। কহিয়া দিলেন, "যাহার হাত হইতে যেখানে এই বাতি পড়িয়া যাইবে, সে সেখানে বিস্তর টাকা পাইবে। তোমরা হিমালয়ের উত্তর দিকে গমন কর।"

চারি বন্ধু চারি বাতি হাতে লইয়া বাহির হইলেন। কিছু দূর গেলেই প্রথমে যিনি চলিয়াছেন, তাঁহার হাত হইতে বাতিটি পড়িয়া গেল। সকলে সেই জায়গা খুঁড়িতে লাগিলেন, দেখিলেন তামার খনি। প্রথম বন্ধু আর তিনজনকে কহিলেন, "আর তোমরা দূরে যাইও না, চল এখান হইতে যত ইচ্ছা তামা লইয়া দেশে যাই। এখন আর আমাদের কোন কষ্ট থাকিবে না।"

আর তিন জন কিছু বেশী লোভী, তাঁহারা কহিলেন, "তুমি এক বোকা। আমাদের যেমন অভাব, এই তামাতে কি সেই অভাব যায়? চল, আরো পথ চলা যা'ক, দেখি ভাগ্যে কি আছে।"

প্রথম ব্রাহ্মণ সেখানেই রহিলেন। তামার খনি পাইয়াই তিনি খুসী। আর তিন জন চলিতে লাগিলেন। প্রথম ব্রাহ্মণ বিস্তর তামা লইয়া আসিয়া বাড়ীতে সুখে রহিলেন।

আর তিন ব্রাহ্মণ চলিতেই লাগিলেন। কিছু দূর গেলে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাতিটি খসিয়া পড়িল। তিনি সেই স্থান খুঁড়িয়া দেখিলেন, এক রূপার খনি। তিনি তো

মহা আনন্দিত। তিনি আর সকলকে কহিলেন, "তোমরা আর দূরে যাইও না, এখান হইতে যত ইচ্ছা রূপা লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও, আর কোন অভাব থাকিবে না।"

আর দুই জন তাঁহার কথা শুনিলেন না। তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "আমাদের যে দুঃখ, যে অভাব—রূপায় কি তাহা পূরণ হয়? পিছনে তামার খনি, এখানে রূপার খনি, সাম্‌নে বোধ হয় সোণার খনি আছে। সোণা পাইলে আমাদের কিছু দুঃখ যাইতে পারে। আমরা সাম্‌নের দিকে যাইবই।"

রূপার খনি যিনি পাইয়াছেন, তিনি সেখানেই রহিলেন। তিনি ইচ্ছা মত রূপা লইয়া দেশে ফিরিলেন, তাঁহার অভাব দূর হইল।

আর দুই জন চলিতেই লাগিলেন। কতকদূর গেলেই এক জনের হাত হইতে বাতি পড়িয়া গেল। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন সোণার খনি! তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা নাই। এবার তাঁহার ঘোর দুঃখ যাইবে, আহ্লাদ হইবে না কেন? তিনি অপর বন্ধুকে সেখান হইতে মনের মত সোণা লইতে বলিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল ইহার পর আর কোন খনি নাই। কিন্তু লোভ বড় পাজি, সে কি সহজে যায়? অপর বন্ধুর মনে বিশ্বাস হইল সম্মুখে হীরা জহরতের খনি আছে। তিনি কহিলেন 'সোণা বড় ভারি, তা' আর কত লইয়া যাইতে পারা যায়? হীরা জহরত অল্প পাইলেই সাত রাজার ধন হইবে।"

যিনি সোণার খনি পাইয়াছেন, তিনি সেখানেই রহিলেন। ইচ্ছা মত সোণা লইয়া অপরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এবার চতুর্থ ব্রাহ্মণ চলিতে লাগিলেন। অনেক পথ হাঁটা হইল, ব্রাহ্মণ বড় কাতর হইলেন। তাঁহার পিপাসা পাইল, ক্ষুধা পাইল, ক্রমে যেন তাঁর জ্ঞান লোপ হইয়া আসিল। ক্ষুধা পিপাসা পাইলে কি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে? বেচারা আসল পথ ভুলিলেন, এখন বিপথে ঘুরিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ কতক্ষণ ঘুরিলেন। কোথাও লোক জনের সাক্ষাৎ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে দেখিলেন একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় এক চক্র—কি ধারাল! সর্ব্বদাই সে চক্র ঘুরিতেছে, আর লোকটার গা বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ তো অবাক। তিনি তাড়াতাড়ি তার কাছে গেলেন। যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আপনার মাথায় এই চক্র ঘুরিতেছে কেন? যা'হক, সে পরে হইবে। আমার এখন পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যায়, জল কোথায় পাইব বলিতে পারেন কি?" ব্রাহ্মণ হাতের বাতি মাটিতে রাখিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় সেই ধারাল চক্র বিদ্যুতের মত আসিয়া তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তো একবারে স্তম্ভিত। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ কি? এই ধারাল চক্র আবার আমার মাথায় আসিয়া ঘুরিতে লাগিল কেন?"

পূর্ব্ব চক্রধারী কহিলেন, "কেন, বলিতে পারি না। এই রকমেই এই চক্র আমার মাথায়ও আসিয়াছিল।"

ব্রাহ্মণ তো কাতর হইয়া কহিলেন, "বেদনায় যে আমার প্রাণ যায়। আমি যে এই চক্রের যাতনা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। এ আপদ কবে আমার মাথা হইতে সরিয়া যাইবে ?"

উত্তর হইল, "তোমার মত কোন লোক যখন হাতের বাতি রাখিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবে, তখন এই চক্র তোমার মাথা হইতে তাহার মাথায় যাইবে।"

ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অবস্থায় আমি কত কাল কাটাইব ?"

আবার উত্তর হইল, "কত কাল বলিতে পারি না। আমার মাথা হইতে কত কাল পরে নামিল তা'ও আমার স্মরণ নাই। এখন পৃথিবীর রাজা কে বলুন দেখি ? কয় জন রাজা গেলেন, তাঁহাদের রাজত্ব কাল শুনিলেই কত কাল হইল বুঝা যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এখন বৎস রাজার রাজত্ব।"

পূর্ব্ব চক্রধারী উত্তর করিলেন, "রাম রাজত্ব সময়ে আমি বড় গরীব হইয়া পড়ি। তখন আমি আপনার মত সিদ্ধ বাতি হাতে লইয়া অর্থ লোভে এখানে আসিয়াছিলাম। আমি আসিয়া দেখি এক জনের মাথায় এই চক্র ঘুরিতেছে। যেই আমি বাতি রাখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলাম, অমনি তাহার মাথার চক্র

আমার মাথায় আসিয়া ঘুরিতে লাগিল। এখন বুঝিয়া দেখ কত কাল আমার মাথায় এই চক্র ঘুরিতেছিল।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "সে তো তবে কত হাজার বৎসর! এত-দিন এভাবে কি করিয়া কাটাইব ? এই চক্র লইয়া কি আপনি খাইতে দাইতে পারিতেন ?"

উত্তর হইল, "এই দেশের রাজা কুবের। কুবেরের ধন কত, তার সংখ্যা নাই। তার বড় ভয়, পাছে কেহ আসিয়া সেই ধন লইয়া যায়। সেই জন্য সৈন্যগণের উপর আদেশ, কেউ যেন এ দেশে আসিতে না পাবে। যদি কেহ দৈবাৎ আসে, তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম থাকে না, তার আর জরা মরণ নাই। সে এই এক ভাবেই থাকে, আর এই বিষম যাতনা ভোগ করে। আপনি আসিয়া আমার বহুকালের যাতনা দূর করিয়াছেন। অনুমতি করুন, এখন আমি দেশে ফিরিয়া যাই।"

মহা আনন্দে পূর্ব্বচক্রধারী দেশে চলিল।

* * * *

যিনি সোণা পাইয়াছেন তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। বন্ধুর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। শেষে তাঁহাকে খুঁজিতে চলিলেন। কতকদূর পায়ের দাগ ধরিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বন্ধু এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁহার মাথায় একটা ধারাল চক্র ঘুরি-তেছে। তাঁহার সারা গায়ে রক্ত, বেদনায় তিনি বড় কাতর,

ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বন্ধুর নিকট গমন করিলেন। তাঁহার মুখে কথা সরিল না। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! তোমার এ কি দশা হইয়াছে?"

চক্রধর উত্তর করিলেন, "ভাই! এ কেবল বিধির বিড়ম্বনা। অধিক আর কি বলিব?"

বন্ধু উত্তর করিলেন, "তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছে, তোমার এই যাতনার কারণটা কি বল দেখি?"

চক্রধর চক্রের বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন।

বন্ধু শুনিয়া চক্রধরকে কত মন্দ বলিয়া, কত তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "ভাই! তখনই আমি তোমাকে বারবার মানা করিয়াছিলাম, আমার কথা একেবারেই গ্রাহ্য করিলে না। এখন এর উপায় কি? শাস্ত্রকারেরা যথার্থই কহিয়াছেন, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া কি বোকামীই করিয়াছ! তোমার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, আর আর কত গুণ আছে, কিন্তু তোমার বিষয়-বুদ্ধি তেমন নাই। বুদ্ধিহীন যে, সে সিংহ-কারকের ন্যায় প্রাণে মারা যায়। গল্পটি কহিতেছি, শোন ঃ—

শাখা গল্প ৩—

সিংহকারকের উপাখ্যান।

এক দেশে চারিজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে খুব বন্ধুতা, খুব ভাব। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন খুব বিদ্বান্, কিন্তু তাঁহাদের কাহারো কিছু বিষয়-বুদ্ধি ছিল না। আর যে একজন ছিলেন, তিনি শাস্ত্র জানিতেন না বটে, কিন্তু তিনি যেমনি ছিলেন চতুর, তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমান। একদিন চারিজন মিলিয়া পরামর্শ করিলেন, "আমরা তো কত যত্ন করিয়া বিদ্যা শিখিয়াছি, কিন্তু তার ফলভোগ করিতে পারি নাই। চল বিদেশে যাই, সেখানে যাইয়া যদি রাজাদিগকে বিদ্যায় সন্তুষ্ট করিতে না পারিলাম, তবে আর বিদ্যা শিখিলাম কি? চল, আমরা সকলে এক সঙ্গে বিদেশে যাই

পরামর্শ স্থির হইল। চারিজনে বিদেশে চলিলেন। কিছু দূর গেলে যিনি বেশী বিদ্বান্, তিনি প্রস্তাব করিলেন,—

"আমাদের চতুর্থ ব্যক্তির কিছুমাত্র বিদ্যা নাই, কেবল যৎ-সামান্য বুদ্ধি আছে। বিদ্যা না থাকিলে রাজার নিকট কেবল বুদ্ধি দ্বারা অর্থ লাভ হয় কি? আমরা তিনজনে বিদ্যাদ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিব, উহাকে তাহার অংশ দিব, তাহা কখনই হইবে না। সে এখান হইতে গৃহে ফিরিয়া যা'ক।"

দ্বিতীয় বিদ্বান্ চতুর্থ ব্যক্তিকে কহিলেন, "ভাই সুবুদ্ধি! তুমি ত বিদ্বান নও। আমাদের বিদ্যা আছে, আমরা যে অর্থ রোজগার করিব, তুমি আমাদের সঙ্গে যাইয়া তাহার ভাগ লইবে, এ তোমার উচিত নয়। তুমি এখান হইতেই বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

তৃতীয় বিদ্বান্ দ্বিতীয়কে বাধা দিয়া কহিলেন,

"ওহে ভাই! তোমাদের কথা কিন্তু আমার বড় ভাল বোধ হয় না। এইরূপ করা কি ঠিক? এ ছেলেবেলা হইতেই আমাদের সঙ্গী। আমরা সকলেই এক সঙ্গে বেড়াইতাম, খেলা করিতাম। ছেলেবেলার বন্ধুতা কি ভোলা যায়, না ছাড়া যায়? আমার মতে ওকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাওয়াই উচিত। আমাদের যাহা উপার্জ্জন হইবে, উহাকে তাহার অংশ দিলে বিশেষ কিছু হানি নাই, বরং কাজটা ভালই হইবে।"

তৃতীয় ব্রাহ্মণের কথায় আর সকলের মত হইল। চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। সকলে একসঙ্গে বনের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, মরা সিংহের কতকগুলি হাড় এলোথেলো পড়িয়া আছে। এক বিদ্বান ইহা দেখিয়া তখনই প্রস্তাব করিলেন—

"বাঃ, বেশ ভাল হইয়াছে। আমরা যে মড়া বাঁচাইতে পারি, আজ তাহার পরীক্ষা হইবে। ঐ দেখ একটা সিংহের

হাড় পড়িয়া আছে। চল, আমরা সঞ্জীবনী বিদ্যায় উহাকে বাঁচাইয়া দিই।"

এই বলিয়া প্রথম পণ্ডিত কহিলেন, "আমি হাড় জোড়া লাগাইবার বিদ্যা শিখিয়াছি, আমি কেবল হাড়গুলি জোড়া লাগাইয়া দিতে পারিব।"

দ্বিতীয় পণ্ডিত কহিলেন, "ভাই! আমি ঐ হাড়গুলিতে চামড়া, মাংস ও রক্ত সংযোগ করিয়া দিতে পারিব।"

তৃতীয় পণ্ডিত কহিলেন, "আমি উহাতে জীবন দিতে পারিব।"

সকল কথা স্থির হইল। প্রথম পণ্ডিত সেই অস্থিগুলি মিলাইয়া একটা কঙ্কাল তৈয়ার করিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত নিজের বিদ্যায় ঐ কঙ্কালে চামড়া, মাংস ও রক্ত সঞ্চার করিয়া দিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত উহাতে জীবন সঞ্চারে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে সেই বুদ্ধিমান চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,

"আরে কর কি, কর কি? এ যে একটা প্রকাণ্ড সিংহ প্রস্তুত হইল! এখন উহাকে জীবন দিলে আমাদের সকলকেই যে খাইয়া ফেলিবে। আমার কথা রাখ, উহাকে বাঁচাইও না।"

এই কথা শুনিয়া তৃতীয় পণ্ডিতের ভারি রাগ হইল। তিনি গর্জ্জিয়া কহিলেন,

"তুমি বোকা কি না, তোমার বোকামীই সার। তোমার কথায় কি আমি আমার বিদ্যা পরীক্ষা করিব না?"

সুবুদ্ধি ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি আগে এই গাছে চড়ি, তার পরে তোমাদের যাহা করিতে হয় তোমরা কর।"

সুবুদ্ধি তো তাড়াতাড়ি একটা উঁচু গাছে উঠিলেন। তৃতীয় বিদ্বান সিংহকে জীবনদান করিলেন। সিংহ অমনি তাঁদের তিন-জনকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল। সিংহ যখন চলিয়া গেল, সুবুদ্ধি গাছ হইতে নামিয়া আপনার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

সিংহকারকের উপাখ্যান শেষ করিয়া যিনি সোণা পাইয়া-ছিলেন তিনি আবার কহিলেন,

"যদি কেউ কেবল শাস্ত্রই জানে, আর লোকের আচার ব্যবহার না জানে, তবে তাহাকে "মূর্খ-পণ্ডিতের" ন্যায় লোকে ঠাট্টা করে।"

তিনি গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন :—

শাখা গল্প ৪—

মূর্খ-পণ্ডিতের উপাখ্যান।

"এক দেশে ছিলেন চারিজন ব্রাহ্মণ। তাঁদের বড় বন্ধুতা। তাঁহারা ছেলেবেলায় ঠিক করিয়াছিলেন বিদেশে যাইয়া

লেখাপড়া শিখিবেন। এখন তাঁহারা সকলে বড় হইয়াছেন, সকলে কান্যকুব্জ নগরে লেখাপড়া শিখিতে গেলেন। সেখানে তাঁহারা এক মঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে বারো বৎসর লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহারা একপ্রকার পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এক দিন সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ করিলেন, "যাহা শিখিবার তাতো শিখিয়াছি। চল আমরা গুরু মহাশয়কে যা' পারি দক্ষিণা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাই।" পরামর্শ ঠিক হইল। সকলে গুরু মহাশয়ের কাছে যাইয়া বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলেন। সকলে অনুমতি পাইয়া আপন আপন পাঁজিপুথি লইয়া দেশে রওনা হইলেন।

কিছু দূর যাইয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, দুইটি পথ দুই দিকে চলিয়াছে। কিন্তু কোন্ পথ ধরিয়া যে তাঁহারা দেশে যাইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না।

সকলে অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে হঠাৎ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন কয়েকজন মহাজন দ্রব্যাদি লইয়া এক পথে যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা কহিলেন,

শাস্ত্রে আছে, "মহাজনেরা যে পথ ধরিয়া যান, সে-ই প্রকৃত পথ। মহাজনেরা এই পথে গিয়াছেন, এই পথই প্রকৃত পথ। আমরাও এই পথেই যাইব।"

সকলে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আবার কতকদূর গেলেন। কিছু দূরে তাঁহারা এক শ্মশান দেখিতে

পাইলেন। সে শ্মশানে একটা গাধা চরিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া পণ্ডিতেরা কহিতে লাগিলেন, "এই শ্মশানে ওটা কি ?"

একজন তখনই পুস্তক খুলিয়া বিচার করিয়া কহিলেন,

"শাস্ত্রে লিখিত আছে, 'শ্মশানে যে বাস করে, সেই বান্ধব।' অতএব এ নিশ্চয়ই আমাদের কোন বান্ধব।"

এই কথায় কেহ তাহার ঘাড় ধরিয়া কোলাকোলী করিলেন, কেহ তাহার পা ধোয়াইয়া দিলেন।

বান্ধবের অভ্যর্থনার পর পণ্ডিতেরা দেখিলেন, একটা উট সেই জায়গা দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে। যেই তাহাকে দেখা, অমনি চারি পণ্ডিতের তর্ক আরম্ভ হইল, "এই রকম সোঁ করিয়া যাইতেছে, এ কি ?"

এক পণ্ডিত পুস্তক দেখিয়া কহিলেন, "শাস্ত্রে আছে, ধর্ম্মই বড় জোরে চলে। আমার মতে এ ধর্ম্মই নিশ্চয়।"

চতুর্থ পণ্ডিত শুনিয়া কহিলেন, "তবে তো ভালই হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে, প্রাণের জিনিষকে ধর্ম্মের সহিত মিশাইবে। তবে চল আমরা বান্ধবকে ধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া দিই।"

তখন সকলে সেই গাধাকে ধরাধরি করিয়া উট্‌টার গলায় বাঁধিয়া দিলেন।

একটা লোক দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। সে তখনি যাইয়া গাধার ধোপাকে সব কথা বলিয়া দিল। ধোপাতো মূর্খ-পণ্ডিতদিগকে শিক্ষা দিতে লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল।

পণ্ডিতগণ দেখিলেন ধোপা "মার মার" করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা কি আর তখন সেখানে থাকেন? একেবারে ঊদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইলেন। গেলেন তাঁরা কিছুদূর। হঠাৎ তাঁহারা এক নদীর তীরে আসিয়া পড়িলেন, সে নদীর বড় খর স্রোত। সেখানে বসিয়া তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, "এই নদী আমরা পার হইব কি করিয়া?" পণ্ডিতগণ বড় ভাবনায় পড়িলেন।

এমন সময়ে একটা পলাশপাতা স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছিল। এক পণ্ডিত বলিলেন, "আমার বোধ হয় এই পলাশপাতায় চড়িয়া আমরা অনায়াসে পার হইতে পারিব।"

তিনি পলাশপাতার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অমনি পণ্ডিত স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

আর এক পণ্ডিত তাঁহার চুলে ধরিয়া কহিলেন, "এতো সর্ব্বনাশ উপস্থিত। শাস্ত্রে লেখা আছে, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিবে।" অর্দ্ধেক থাকিলেও তো কাজ চলিতে পারে, কিন্তু সবটা হারানো সহ্য করা যায় না।" সেই পণ্ডিত তখনই জলে-পড়া পণ্ডিতের মাথাটি কাটিয়া লইলেন।

এবার পণ্ডিতেরা পিছনে ফিরিয়া আর এক পথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহারা কিছুদূর গেলে গ্রামের কয়েকজন ভদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন। তিন পণ্ডিতই তিন গৃহস্থের বাটীতে খাইতে গেলেন।

এক পণ্ডিত তো খাইতে বসিয়াছেন, তিনি মিষ্টান্নে এক

গাছি লম্বা সূতা দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার খাওয়া বন্ধ হইল, তিনি সেই লম্বা সূতা হাতে করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শাস্ত্র ভাবিয়া কহিলেন, "দীর্ঘসূত্রীর মরণ নিশ্চয়। এই গৃহস্থ আমাকে দীর্ঘসূত্রী করিতে চাহিতেছেন, খাওয়ানো তো তার ছলনা। আর আমার খাওয়া হইল না।"

পণ্ডিত মহাশয় তখনি থালা ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। গৃহস্থতো একেবারে অবাক্ !

দ্বিতীয় পণ্ডিত আর এক গৃহস্থের ঘরে খাইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পাতে পরমান্ন দেওয়া হইল। পরমান্নে দুধ ছিল বেশী। উহা থালায় ছড়াইয়া পড়িল। পণ্ডিত কহিলেন, 'খাওয়ার জিনিষ লম্বা চৌড়া হইলে আয়ুঃক্ষয়ের কারণ হয়।' দ্বিতীয় পণ্ডিত তখনই পাত ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় পণ্ডিত আর এক গৃহস্থের ঘরে খাইতে বসিয়াছেন। থালায় পিঠা দেওয়া হইল। তিনি কহিলেন, "ইহাতে কেবল ছেঁদা যে! শাস্ত্রে আছে, 'বিপদ ছিদ্র পাইলেই বাড়িয়া যায়।" যে জিনিসে এত ছেঁদা, সে জিনিস আমি খাইব না। তৃতীয় পণ্ডিত খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

তিন পণ্ডিতই অতি বিদ্বান কিনা, তাঁহারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। গ্রামের লোকেরা পণ্ডিতদিগকে কত ঠাট্টা, কত উপহাস করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা লজ্জায় কি

আর মুখ তুলিতে পারেন? তাঁহারা মুখ লুকাইয়া পলাইয়া গেলেন।

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্পটি শেষ হইল। স্বর্ণপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান চক্রধরকে কহিলেন, "কেবল শাস্ত্র জানিলে হয় না, লোকাচার না জানিলে মূর্খ পণ্ডিতের মত সকলের কাছে ঠাট্টা বিদ্রূপ পাইতে হয়।"

চক্রধর কহিলেন, "ভাই! আমার এ বিপদ অকারণ বলিতে হইবে। বিধাতা যাঁর উপর বিমুখ হন, হাজার বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেও তিনি মারা যান। আর বিধি অনুকূল হইলে অল্পবুদ্ধি লোকেরও সুখের সীমা থাকে না।"

আমি এই বিষয় বুঝাইতে 'শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধির' দুর্দ্দশার ও একবুদ্ধির সুখের কথা কহিতেছি শোনঃ—

শাখাগল্প ৫—

শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি ও একবুদ্ধির উপাখ্যান।

এক পুকুরে শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধি নামে দুইটা মাছ থাকিত। সেখানে একবুদ্ধি নামে একটা ব্যাঙও বাস করিত। মাছ দুটোর সঙ্গে ব্যাঙটার বড় মিত্রতা, তাহারা হাসিয়া খেলিয়া পরম সুখে কাল কাটাইত।

একদিন তাহারা সকলে বসিয়া খুব গল্প করিতেছে। সেই সময়ে কতকগুলি জেলে আর আর পুকুর হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী চলিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহারা সেই পুকুরের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কথা হইতেছিল—

"এই পুকুরটাতে মাছ বিস্তর,জলও তেমন অধিক নয়। কাল ভোরে আসিয়া এই পুকুরের সব মাছ ধরিব।" জেলেরা চলিয়া যাইতে লাগিল। জেলের কথা মাছেরা শুনিতে পাইল। তাহারা বড়ই ভীত হইল। তখন সকলে মিলিয়া প্রাণরক্ষার পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাঙ্ কহিল, 'ভাই শতবুদ্ধি! ভাই সহস্রবুদ্ধি! এখন কি উপায় স্থির করিলে? পলাইয়া যাওয়াই ভাল, না এখানে থাকাই ভাল?'

সহস্রবুদ্ধি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, 'ওহে মিত্র! এত উতলা হইলে কেন? কেবল কথা শুনিয়াই ভয় পাওয়া উচিত কি? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এখানে জেলেরা আসিতে পারে না, তাদের আসা অসম্ভব। আর যদি তাহারা একান্তই আসে, তবে বুদ্ধিতো আমার আছে, আমি আমার নিজেকেও বাঁচাইতে পারিব, তোমাকেও বাঁচাইতে পারিব। আমি অনেক প্রকার কৌশল জানি, তোমার কোন চিন্তা নাই।"

শতবুদ্ধি শুনিয়া কহিল, 'মিত্র! সহস্রবুদ্ধি তো ঠিক কথাই কহিয়াছেন। বুদ্ধিমানের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কৌশল

থাকিলে সব হয়। শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন, 'যেখানে বায়ু কি সূর্য্যের আলো যাইতে পারে না, সেখানেও বুদ্ধিমানের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে।' বাস্তবিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য স্থান নাই। কেবল একটা কথা শুনিয়া পূর্ব্বপুরুষের বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া যাওয়া উচিত হইবে না। আমার কথা নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি কখনও অন্য স্থানে যাইব না। নিজবুদ্ধিতে আমি আমাকে রক্ষা করিব, আর তোমাকেও রক্ষা করিতে পারিব, তুমি চিন্তা করিও না।"

ব্যাঙের বড় ভয়। সে কহিল, 'তোমাদের পরামর্শ আমার নিকট ভাল লাগিতেছে না। আমার কিন্তু পলাইতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার মতে পলায়ন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। অতএব আমি আজই পরিবার লইয়া আর কোন জলাশয়ে চলিয়া যাইব।'

ব্যাঙের ভয় দেখিয়া মাছেরা হাসিতে লাগিল। ব্যাঙ সেই রাত্রিতেই পরিবার লইয়া অন্য এক জলাশয়ে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব উঠিলেন। পূর্ব্বদিক হাসিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে সেই পুকুরে যমদূতের ন্যায় কয়েকজন জেলে জাল পাশ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জাল দিয়া পুকুরটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কত মাছ, কত কচ্ছপ, কত ব্যাঙ, কত কাঁকড়া সেই জালে ধরা পড়িল। শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধি নানা কৌশলে অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিল। অবশেষে যখন সকল বুদ্ধি ফুরাইল, তাহারাও ধরা পড়িল।

বেলা প্রায় শেষ হইল, জেলেরা জাল ও মাছ লইয়া ঘরে চলিল। শতবুদ্ধি বড় ভারী মাছ, একজন জেলে কেবল তাহা-কেই মাথায় করিয়া চলিয়াছে। সহস্রবুদ্ধি তত বড় বা ভারী ছিল না। একজনে তাহার মুখে দড়ি বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল।

আজ জেলেদের মহা আনন্দ। তাহারা বড় বড় মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। পথে এক জলাশয় ছিল। সেখানে সেই ব্যাঙ পলাইয়া গিয়াছিল। সে সেই জলাশয় হইতে জেলেরা যে মাছ লইয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইল। সে তাহার স্ত্রীকে কহিল, 'দেখ, দেখ, শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধির দুর্গতি দেখ। ঐ দেখ শতবুদ্ধিকে এক জন মাথায় করিয়া আর সহস্রবুদ্ধিকে আর একজনে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমার একমাত্র বুদ্ধি। আমি এই জলাশয়ে পলাইয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি। না পলাইলে আমারও তো ঐ দুরবস্থাই হইত!'

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্পটী শেষ হইল। যিনি সোণা পাইয়াছেন, তিনি চক্রধরকে কহিলেন, "এক বিষয়ে তুখোড় বুদ্ধি থাকিলেই ভাল। নানা বিষয়ে অল্প অল্প বুদ্ধি থাকিলে তাহাকে সুবুদ্ধি বলা যায় না। যাঁহার বুদ্ধি বেশী, তাঁহাকেও বন্ধুর কথা অবহেলা করিলে কষ্ট পাইতে হয়।"

যিনি সোণা পাইয়াছেন, তিনি কহিলেন, "এই বিষয়ে এক গল্প আছে, শোন :—

শাখা গল্প ৬—

'উদ্ধত' শেয়াল ও এক গাধার উপাখ্যান।

এক গ্রামে ছিল এক গাধা, তার নাম ছিল 'উদ্ধত'। সে সারা দিন ধোপার ঘরে কাপড়ের বোঝা বহিত, আর রাত্রি হইলে মাঠে মাঠে চরিয়া বেড়াইত। ধোপা ছিল বড় গরীব, ভাল করিয়া নিজেও খাইতে পাইত না, গাধাটাকেও খাওয়াইতে পারিত না। সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়াই ধোপা গাধাটাকে মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দিত।

এক দিন গাধাটাতো ক্ষেতে ক্ষেতে চরিতেছে, দৈবযোগে এক শেয়ালের সঙ্গে তাহার মিত্রতা হইল। দুইজনেই রাতের বেলায় বেড়া ভাঙ্গিয়া পরের কাঁকুড়ক্ষেতে ঢোকে, আর খুব কাঁকুড় খায়। সমস্ত রাত্রি খাইয়া যেই পেট ভরে, অমনি ভোরে ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপ সুখে তো তাহাদের কিছুদিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

এক দিন দুইজনেই ক্ষেতে গিয়াছে। খুব ফল খায়, পাতা খায়। গাধা শেয়ালটাকে কহিল, "ভাগিনে! দেখ, আজ কি সুন্দর রাত, কি সুন্দর জ্যোৎস্না! আজ যেন পৃথিবী হাসিতেছে। আজ চাঁদের কি সুন্দর মূর্ত্তি! এই শোভা দেখিয়া

আমার মনে কিন্তু বড়ই আনন্দ হইতেছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমি এখানে কিছুক্ষণ গান গাই। এই সময়ে কোন্ রাগিণীটা ধরা যায়, বলতো ?"

শেয়াল উত্তর করিল, "মামা! খামখা বিপদ ডাকিয়া আনিবে কেন? আমরা দুইজনেইতো চোরের কায করিতে আসিয়াছি, আমাদের দুইজনেরই চুপচাপ করিয়া চলিয়া যাওয়া ভাল। আরো কথা, তোমার গানতো আর লোকে শুনিতে চায় না: সে যেন শাঁকের আওয়াজ! কি কর্কশ, কাণ ঝালাপালা করে। এ যাদের ক্ষেত, তারা দূর হইতে তোমার গান শুনিলে এখনই আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া মারিয়া ফেলিবে। তাই বলি, মামা! ক্ষান্ত হও, গানের দরকার নাই। চল আমরা এই ক্ষেতের কাঁকুড়, শশা, ফুটি যা' পাই খাইয়া এখান হইতে চলিয়া যাই। পরের ক্ষেতে গান গাইবার আবশ্যক কি ?"

শেয়ালের উপদেশ শুনিয়া গাধাটার বড় রাগ হইল। সে চোখ্ ঘুরাইয়া ব্যঙ্গ করিতে করিতে কহিল, "তুই বনে থাকিস্, তোর বুদ্ধিও বোনোর মত। তুই গানের রস জান্‌বি কি, বুঝ্‌বি কি ? জানিলে কখনও এমন কথা কহিতিস্ না।"

শেয়াল উত্তর করিল, "মামা! তোমার কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু মামা! তোমার গান যে বড় কর্কশ, শুনিতে ইচ্ছা হয় না। অনর্থক এমন গান গাইয়া আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিবে কেন ?"

গাধাটা আপনার গান আপনি ভালবাসে। বোকার নিয়মই এই। গাধা কহিল, "আরে ছি, ছি! আমি কি গান বাজনা কিছুই জানি না? তবে শোন্ দেখি আমি কিছু জানি কি না? একটু গাইলেই তো বুঝিতে পারিবি?"

গাধা রাগ রাগিণীর মস্ত পরিচয় দিয়া কহিল, "তুই ভাগ্‌নে, আমি মামা। ভাগ্‌নে হইয়া মামাকে বোকা ঠাওরাস্, আর মামাকে গান গাইতে নিষেধ করিস্? তোর মত আহাম্মক তো আর দেখি নাই।"

শেয়াল কি করিবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া কহিল, "মামা! যদি একান্তই গান গাহিতে ইচ্ছা থাকে, তবে গাইতে আরম্ভ কর। আমি এখান হইতে ঐখানে যাইয়া বেড়ার নিকট দাঁড়াইয়া থাকি। যদি কাকেও আসিতে দেখি, ইসারা করিয়া তোমাকে জানাইব। তুমি পলাইতে পারিবে।"

শৃগাল তখনই ক্ষেতের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইল। গাধার গোঁ, সে কি আর গান না গাইয়া থাকিতে পারে? ঊর্দ্ধমুখ হইয়া গাধাতো গান ধরিল।

ক্ষেতের মধ্যে গাধার গান,—কি সুন্দর তার সুর! শুনিয়াই তো চাষারা জাগিল। একে ঘুম নষ্ট, তার উপর শস্য নষ্ট, তাহারা বিরক্ত হইয়া তখনই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। গাধাতো গাধা। তার জ্ঞান নাই, সে গানই গাইতে লাগিল। চাষারা লাঠি দিয়া গাধাটাকে বেদম মা'র দিতে

লাগিল। মা'রের চোটে গাধা তো অজ্ঞান হইল, মাটিতে পড়িয়া গেল। চাষারা তখন একটা ভারি যাঁতা তাহার গলায় বাঁধিয়া রাখিয়া ঘুমাইতে গেল। মনে করিল এত বড় ভারটা লইয়া গাধা পলাইতে পারিবে না, ভোর হইলে যা' হয় করিব। গাধার স্বভাব বিচিত্র, দেখিতে দেখিতেই তার বেদনা গেল। যে রোজ রোজ প্রহার-গুঁতো খায়, তার শরীরই অন্য রকমের। গাধা সেই উদূখল লইয়া ক্ষেতের বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল।

শেয়ালটা ছিল আড়ালে। সে দেখিল, গাধা যাঁতাটা লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সে তখন মুচ্‌কি হাসিয়া গাধাকে কহিল,

"মামা! বেশ গান গাহিয়াছ। তখন আমার কথা শুনিলে না, ফল পাইলে গলায় এই মালা! কেমন, মামা, যেমন সুন্দর গান গাহিয়াছিলে, পুরস্কারও মিলিয়াছে তেমনি। বলিয়াছিলাম ভাল কথা, তুমি শুনিলে না। এখন ফল হইল কি?"

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্পটী শেষ হইলে সোণার মালিক কহিলেন, "ভাই! আমিও তোমাকে এদিকে আসিতে বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা শুনিলে না, লোভে পড়িয়া চলিয়া আসিলে।"

চক্রধর কহিলেন, "বন্ধু! কথাগুলি সকলই সত্য। শাস্ত্রেও

আছে, যার বুদ্ধি নাই সে যদি মিত্রের কথা ঠেলিয়া, তুচ্ছ করিয়া, কায করিতে যায়, তবে তার পদে পদে বিপদ্ ঘটে। শেষে তার মন্থর তাঁতির মত মরিতে হয়।”

চক্রধর উপাখ্যানটী কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

শাখাগল্প ৭—

মন্থর তাঁতির উপাখ্যান।

এক দেশে ছিল এক তাঁতি—তার নাম মন্থর। সে রোজ তাঁতের কায করিয়া সংসার চালাইত। দৈবের ঘটনা, একদিন তাহার তাঁতের কাঠ ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁতির তো ভারি উদ্বেগ। তাঁত না হইলে তার চলিবে কেন? এক দিন সে কুড়ুল লইয়া তো কাঠ কাটিয়া আনিতে বাহির হইল। এ বন ও বন ঘুরিল, ভাল কাঠ আর সে পাইল না। শেষে সে এক সমুদ্রের তীরে যাইয়া উপস্থিত। মন্থর দেখিল সেখানে এক প্রকাণ্ড শিমূল গাছ—যেমন উচু, তেমনি মোটা। তাঁতির ভারি আনন্দ, মনে করিল, ‘খুব বড় গাছ, এই কাঠেই আমার ঢের কাজ হইবে।’

তাঁতি তো সেই শিমূল গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। যেমন দুই এক ঘা কুড়ুল মারিয়াছে, অমনি সেই গাছের এক পিশাচ তাহাকে কহিল, “ওহে তাঁতি! এই গাছটিতে আমি থাকি, ইহাকে কাটিও না। আমি পিশাচ, এই গাছে বহুকাল বাস

করিতেছি। এই দেখ সমুদ্রের তীর কি সুন্দর! কি সুন্দর বায়ু আমি সেবন করি। বুঝিতে পারিতেছ তো কি সুখে আমি থাকি? তুমি এই গাছে ঘা মারিয়া আমাকে কষ্ট দিও না।”

পিশাচের কথা শুনিয়া তাঁতির ত্রো ভয় হইল। সে যোড় হাত করিয়া কহিল,

“ঠাকুর! আমি জাতিতে তাঁতি। আমার তাঁতে যে কাঠ-পাট ছিল, তা’ সকলই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেকদিন হইতে আমার কোন কাজকর্ম্ম নাই, আর আমার সংসার চলে না। আমার পরিবারের লোক খাইতে না পাইয়া মর-মর। তাঁতের কাঠখড়ি ঠিক না করিলে আর কোন মতেই আমার সংসার চলিবে না। আপনি তো গাছ কাটিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু আমার ও আমার পরিবারের গতি কি হইবে?’

পিশাচ কহিল, “ওহে তাঁতি! ব্যস্ত হইও না, কিছু ভাবিও না। আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তোমার কিছু চাহিবার থাকে, চাও। আমি এখনই তাহা দিয়া তোমার ও পরিবারের উপকার করিব। কিন্তু তুমি গাছটি কাটিও না।”

তাঁতি ভারি খুসী, সে স্বীকার করিল, গাছটি কাটিবে না। তাঁতি আনন্দে কহিল, “আপনার যখন এত অনুগ্রহ, আমি কি চাহিব ঠিক করিতে পারি না। আমি একবার আমার বন্ধু ও স্ত্রীকে এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা যা চাহিতে বলেন, তা-ই চাহিব, সেইটি পূর্ণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।”

পিশাচ শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, বেশ, বেশ, তাহাই হইবে।" তাঁতি আনন্দে নাচিতে নাচিতে ঘরে ফিরিয়া চলিল। পথে এক নাপিত বন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইল। বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁতি কিন্তু বড়ই খুসী হইল। সে আনন্দে কহিল,

"বন্ধু! আজ এক পিশাচ আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি আমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। কি বর যে প্রার্থনা করিব, বলিয়া দাও তো?"

নাপিত পরামর্শ দিল, "যদি তিনি তোমার উপর প্রসন্নই হইয়া থাকেন, তাঁহার নিকট এক রাজ্য প্রার্থনা কর। তিনি অনায়াসেই তো তোমাকে রাজা করিয়া দিতে পারেন। তুমি রাজা হইলে আমি হইব তোমার মন্ত্রী। তখন আমাদের দুঃখ যাইবে, দু'জনের খুব সুখ হইবে। এই কালের তো ভাল ব্যবস্থা হউক, তারপর পরকালের কথা।"

এই পরামর্শেও তাঁতির আশা মিটিল না। সে আনন্দে ডগমগ হইয়া এই সুসংবাদ নিজের স্ত্রীকে জানাইতে ব্যস্ত হইল। সে নাপিতবন্ধুকে কহিল, "ভাই! তোমার পরামর্শতো শুনিলাম। একবার ঘরে যাইয়া পত্নীকে' জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার কি মত।"

'স্ত্রীর পরামর্শ শুনিতে হইবে' শুনিয়া নাপিততো অবাক্। সে কহিল, "বল কি, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিবে? ও কাজ করিও না, মারা যাইবে। যে স্ত্রীর পরামর্শ লইয়া চলে, সে কি মানুষ? তার কষ্ট আর ঘোচে না।"

তাঁতির ইচ্ছা খুব, করে কি—বন্ধুর যে নিষেধ! সে সায় দিয়া কহিল "বন্ধু, কথাতো ঠিক। তবে কি জান, পতিব্রতা বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে দোষ কি ?"

নাপিতের নিষেধ গ্রাহ্য হইল না। তাঁতি তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল। সে আহ্লাদে স্ত্রীকে কহিল, "আজ কাঠ কাটিতে গিয়াছিলাম। এক পিশাচকে প্রসন্ন করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমায় বর দিতে চাহিয়াছেন। এখন কি বর চাহিব, শীঘ্র বল দেখি ? এখনই সেই পিশাচের নিকট আবার যাইতে হইবে। পথে নাপিত মিত্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। সে কিন্তু এক রাজ্য প্রার্থনা করিতে বলিল।"

তাঁতির তো স্ত্রী—সে আর বুঝিবে কত ? রাজ্য প্রার্থনা করা সে ভাল বুঝিল না। সে কহিল "নাপিতের যেমনি বুদ্ধি, তেমনি পরামর্শ। আপনি তাহার পরামর্শ শুনিবেন না। কোন ভাল কাজে নাপিতের পরামর্শ লওয়া শাস্ত্রের নিষেধ। নাপিত যে অযাত্রা! আপনি রাজ্য প্রার্থনা কখনো করিবেন না। রাজত্বে কত উৎপাত, তাহা আপনি কিছুই অবগত নন্। রাজ্যরক্ষায় কত ঝগড়া-ঝাটি, কত চিন্তা। তাতে শরীর থাকে না। রাজ্য পাইলে আপনি কিছুতেই সুখী হইতে পারিবেন না। আমার পরামর্শ শুনুন, রাজ্য চাহিবেন না।"

তাঁতি কহিল, "ঠিক বলিয়াছ, রাজ্যে দরকার নাই। তবে কি বর চাহিব ?"

তাঁতির স্ত্রী কহিল, "আপনি দিনরাত খাটিয়া রোজ একখানি কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকেন। তাহাতেই আমাদের সংসার চলে। আপনি পিশাচের নিকটে এই বর চান যে, আপনার আর এক প্রস্থ হাত আর একটি মাথা বেশী হউক। তাহা হইলেই আপনি সাম্‌নে পিছনে দুই দিকেই এক এক খানি করিয়া কাপড় বুনিতে পারিবেন। রোজ যদি দুই দুই খানি কাপড় তৈয়ারী হয়, একখানি বিক্রয় করিয়া সংসার চলিবে, আর এক খানির দামে দশ কায করিয়া আপনার জাতির মধ্যে গণ্যমান্য হইতে পারিবেন। আমাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকিবে না।"

তাঁতি স্ত্রীর পরামর্শে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "তুমি বেশ পরামর্শ দিয়াছ। আমি এখনই যাইয়া এই বর চাহিব।"

তাঁতিতো চলিয়া গেল। সে বড় খুসি, স্ত্রীর পরামর্শেই তার মত হইয়াছে। সে পিশাচের নিকট হাতযোড় করিয়া প্রার্থনা করিল, "আমাকে এই বর দিন, আমার আর এক প্রস্থ হাত ও আর একটি মাথা বেশী হউক।"

পিশাচ কহিল, "তথাস্তু, তাহাই হইবে!" তখনি তাঁতির আরো দুই হাত বাড়িল, এক মাথা বাড়িল। হইল সে এক অদ্ভুত জীব। পিশাচকে প্রণাম করিয়া তাঁতিতো ঘরে চলিয়াছে। রাস্তার লোকেরা মনে করিল একটা রাক্ষস আসিতেছে। অনেকের হইল ভয়। অনেকে লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিল। কেউ কেউ খুব মারিল। কেউ দূর হইতে ঢিল

ছুড়িয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিতে লাগিল। বড় বেশী দেরী হইল না, তাঁতি লোকের মা'র খাইতে খাইতে মরিয়া গেল।

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

মন্থর তাঁতির উপাখ্যান শেষ হইল। চক্রধর কহিলেন, "তাই বলিতেছিলাম 'যে নিজে বোকা, তার উপর যে বন্ধুর কথা না শোনে, সে মন্থর তাঁতির মত মরিবেই।'

চক্রধর আবার কহিলেন, "মানুষ আশায় বাঁচে। অতি বেশী আশা করিলে কোন কাজ হয় না, লোকে ঠাট্টা করে। আশার দাস হইয়া, অসম্ভব বিষয়ে বৃথা চিন্তা করিলে, সোমশর্ম্মার পিতার মত ফল পাইতে হয়।"

চক্রধর উপাখ্যানটি কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

শাখাগল্প ৮—

সোমশর্ম্মার পিতার উপাখ্যান।

"এক দেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন,—নাম 'স্বভাব-কৃপণ।' তিনি বড় দরিদ্র, দুঃখে কষ্টে তার দিন কাটে। ভিক্ষাই তাঁর পেশা,—তিনি রোজ রোজ ছাতু ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। তার কিছু খাইতেন, আর কিছু একটা কলসিতে জমা করিতেন। ব্রাহ্মণ কলসিটি যেখানে সেখানে রাখিতে ভরসা পাইতেন না,

কি জানি কেউ যদি চুরি করিয়া লইয়া যায়, বা যদি সেই ছাতু ইঁদুর বিড়ালে খাইয়া ফেলে। তাই তিনি কলসটিকে কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহার নীচে নিজে শুইয়া থাকিতেন। কিছু দিন যায়, ছাতুতে কলসটি পূর্ণ হইল।

একদিন ব্রাহ্মণতো শুইয়া আছেন, কত তাঁর ভাবনা। হঠাৎ কলসিটির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'যদি এই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তবেতো বেশ লাভ হইবে? আমার যে এক কলসি ছাতু আছে। বেচিলে কি কম টাকা লাভ হইবে? সেই টাকায় এক যোড়া ছাগ কিনিব। ছাগের ছানা হয় ছয় মাসে। তাহাদের একবারে অনেকগুলি ছানা জন্মে। দুই এক বৎসর মধ্যেই তো আমার এক পাল ছাগল হইবে। যখন দেখিব অনেকগুলি হইয়াছে, তখন সেগুলিকে বিক্রী করিয়া গরু কিনিব। তারা দুধ দিবে, বাচ্চা দিবে। দুধ আর বাছুর বিক্রী করিলেও বেশ টাকা পাইব। সেই লাভের টাকায় কয়েকটা মহিষী কিনিয়া আনিব। মহিষীর দুধ ও বাছুর বেচিয়া ঘোড়া কিনিতে পারিব। ক্রমে তাহারা প্রসব করিবে, তখন আমার অনেক ঘোড়া হইবে। যখন ঘোড়া বিক্রী আরম্ভ করিব, তখন আমার আর ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবে না।'

ঘোড়া বিক্রীর লাভে তখন বড় বড় ভাল ভাল কোটাবাড়ী, বালাখানা তৈয়ার করিব। তখন আর কি? আমার বাড়ী, ঘর, সকলই বড় লোকের মত হইবে। তখন আত্মীয় স্বজন,

ইয়ার বন্ধু লইয়া কত আমোদ করিব। আমার বাড়ীতে তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কত আসা যাওয়া হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণের সুন্দরী মেয়ে থাকে, তিনি আমাকে বিবাহ দিতে চাহিবেন।

বিবাহ হইলে কালে পুত্র জন্মিবে। পুত্রের নাম রাখিব সোমশর্ম্মা। যখন ছেলে হাঁটিতে পারিবে, আমি তখন বই লইয়া নির্জ্জনে ঘোড়ার আস্তাবলে শাস্ত্র চিন্তা করিতে থাকিব। সোমশর্ম্মা তার মার কোলে মাই খাইতে খাইতে আমাকে দেখিবে। সে তখনই তার মার কোল হইতে নামিতে চাহিবে। হামাগুড়ি দিয়া সেতো আমার কাছে আসিতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিব যে সে ঘোড়ার পার নিকট দিয়া আসিতেছে, তখন আমি ব্রাহ্মণীকে খুব গালিমন্দ দিব আর ডাকিব, "ওগো শীঘ্র এস, খোকা মারা পড়ে যে।

ব্রাহ্মণী সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিবে। সে আমার কথা শুনিয়াও শুনিবে না। তখন আর আমি রাগ সহ্য করিতে পারিব না। উঠিয়া গিয়া তখনই আমি তাহাকে এই রকমে এক লাথি মারিব।"

ব্রাহ্মণতো চিন্তায় বিভোর। যেই পা ছুড়িলেন, ছাতুর কলসি অমনি ভাঙ্গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সারা গায়ে ছাতু পড়িয়া ব্রাহ্মণ রংদার হইলেন। তখন নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের চমক ভাঙ্গিল, তিনি আপনাকে যেই ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। তাঁহার আকাশ কুসুম ঝড়িয়া পড়িল!

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

এই গল্পটী শেষ করিয়া চক্রধর কহিলেন, "আশার দাস হইয়া অসম্ভব বিষয়ের চিন্তা করিতে গেলে সোমশর্ম্মার পিতার ন্যায় অবস্থা পাইতে হয়।"

বন্ধু কহিলেন, "একথা ঠিক। গোঁয়ার স্বভাবের হইয়া কাজ করিলে, আর ভবিষ্যতে কি হইবে না ভাবিলে, রাজা চন্দ্রের মত দুরবস্থায় পড়িতে হয়।"

বন্ধু গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন ;—

শাখা গল্প ৯—

চন্দ্র রাজার উপাখ্যান।

"এক নগরে ছিলেন এক রাজা,—নাম 'চন্দ্র'। তাঁর অনেকগুলি ছেলে ছিল। রাজকুমারগণের খেলার জন্য কতকগুলি বানর ছিল। আর যারা অতি শিশু, তাদের গাড়ী টানাইবার জন্য ছিল কতকগুলি মেষ। বানর ও মেষগুলি রোজ রোজ ভাল ভাল জিনিষ খাইয়া বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিল।

একটা বানর ছিল পালের গোদা। তার বেশ কাণ্ডজ্ঞান ও বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। মেষগুলি যে ছিল, তার মধ্যে একটা মেষ ছিল বড় লোভী। সে রাজার রান্নাঘরে যখন তখন ঢুকিয়া যাহা সম্মুখে পাইত, তাহাই খাইয়া ফেলিত। বামনঠাকুর

তাহাকে দেখিলেই কাঠ পাথর যাহা পাইত, তাহাই ছুড়িয়া মারিত। মেষটা তাড়া খাইয়া পলাইয়া যাইত।

একদিন পালের গোঁদা বানর গাধার মার খাওয়া দেখিয়া চিন্তা করিল,—"এই যে মেষ ও বামনঠাকুদের রেষারেষি,ইহাতে আমাদিগেরই সর্ব্বনাশ। মেষ লোভী, সে টকের স্বাদ ভুলিতে পারিবে না, সে রান্নাঘরে ঢুকিবেই! বামনঠাকুরেরাও যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া আছে। তাহারাও তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টায় থাকিবে। আরো দেখিতেছি মেষ যখন রান্নাঘরে যাইয়া উৎপাত করে, পাচকেরাও তখন যাহা পায়, তাহা ছুড়িয়া মারে। আমার ভয় যদি কোনদিন কিছু না পাইয়া তারা জ্বালান কাঠ তাহাকে ছুড়িয়া মারে। তাহা হইলে আমাদের নিস্তার নাই। ওর গায়ে যে লম্বা লম্বা লোম, সামান্য আগুনেই তা' জ্বলিয়া উঠিবে। মেষ ঢুকিবে তখন সম্মুখের আস্তাবলে। সেখানে বিস্তর শুক্নো খড় আছে, আগুনের ধাজ্ পাইলেই খড় জ্বলিয়া উঠিবে। ঘোড়াগুলি থাকে সেই ঘরে। তাহারাও তখন সেই আগুনে পুড়িতে থাকিবে।

ঘোড়ার চিকিৎসকের মুখে শুনিয়াছি, ঘোড়া আগুনে পুড়িলে বানরের চর্ব্বি তাহার শান্তি করে। বানরের চর্ব্বি আবশ্যক হইলে আমাদের নিস্তার নাই। আমার যেন বোধ হয়, আমাদের মৃত্যু অতি নিকট।"

পালের গোঁদা বানর বানরদিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিল,—

"মেষের উপর বামনঠাকুরদের তো বড়ই রাগ। আমার বোধ হয় ইহাতে বানরদেরই সর্ব্বনাশ। যে ঘরে কেবল ঝগড়া-বিবাদ, প্রাণ বাঁচাইতে হইলে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আমাদের সকলের, প্রাণ রক্ষা পায়, তাহার উপায় দেখা এখন আবশ্যক। আমার পরামর্শ এই,—"চল আমরা রাজবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাই, কোন বনে যাইয়া সুখে থাকি।"

দল হইলেই নিয়ম এই, কতকগুলি লোক উদ্ধত থাকে। তাহারা সকল কথাই কাটিতে চায়। বানরেরাও তা-ই করিল। কতকগুলি বানর ঠাট্টা করিতে করিতে বৃদ্ধ বানরকে কহিল,—

"তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ কিনা, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছে। বুদ্ধি থাকিলে এমন কথাও মুখে আনে? আমাদের দুঃখ কি? কি সুখে না আমরা আছি? রাজকুমারেরা নিজ হাতে আমাদিগকে অমৃতের মত ফল খাওয়ান্, কত ভাল ভাল খাবার দেন, কত যত্নে আমাদিগকে প্রতিপালন করেন! এমন সুখ ছাড়িয়া কি আমরা বনের সেই টক, তেতো, কষায় ফল খাইয়া কষ্টে দিন গুজরাইব? তোমার কি উত্তম বুদ্ধি, বাবা?"

বানরের রাজা বানরগুলির কথা শুনিয়া কহিল,—

"ওরে তোরা বড় বোকা! এ সুখের পরিণাম কি হইবে, তাহা কি তোরা বুঝিতে পারিস্? তোদের কাছে এখন এইটা বড়ই ভাল লাগিতেছে, পরে কিন্তু বিষের মত লাগিবে। তখন মজা বুঝিতে পাইবি। তোরা যা ভাল বুঝিস্, তাই তোরা কর্।

২০৯]

আমি কিন্তু এখানে থাকিয়া চক্ষের উপর তোদের সর্ব্বনাশ দেখিতে পারিব না। আমি এখনই বনে চলিয়া যাইব।"

কথায়ও যা, কাজেও তা। প্রধান বানরটা বানরগুলিকে ছাড়িয়া একাই বনে চলিয়া গেল।

একদিন তো সেই লোভী মেষ রাজার রান্নাঘরে ঢুকিল। সাম্‌নে যা পাইল, সে তা-ই খাইতে লাগিল। পাচক তা দেখিয়া সাম্‌নে তো আর কিছু পাইল না, পাইল এক আধপোড়া কাঠ। সে তা-ই খুব জোরে ছুড়িয়া মারিল। কাঠটা তখনও জ্বলিতেছিল। গায়ে পড়া মাত্রই সেই আধ পোড়া কাঠে মেষের লোমগুলি জ্বলিয়া উঠিল। ফর্ ফর্ করিয়া লোম পুড়িতে লাগিল। মেষ তো অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িল। সাম্‌নে ছিল রাজার আস্তাবল, মেষ সেখানেই ঢুকিল। সেই আস্তাবলে ছিল বিস্তর শুক্‌নো খড়। মেষ গায়ের আগুন নিবাইতে সেই খড়ের গাদায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শুক্‌নো খড়ের গাদা আগুন পাইয়া তখনই জ্বলিয়া উঠিল।

আস্তাবলে বিষম অগ্নিকাণ্ড—রাজার ঘোড়া গুলি সেই আস্তাবলে। আগুন দেখিয়া ঘোড়া গুলি লাফাইতে লাগিল, চেঁচাইতে লাগিল। যখন দড়ি ছিঁড়িতে পারিল না, তাহারা দাঁড়াইয়া পুড়িতে লাগিল। অনেক ঘোড়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়া গেল। যেগুলি বাকী ছিল, সেগুলি পোড়া দড়ি ছিঁড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

রাজা এই খবর শুনিলেন। তিনি বড় ব্যস্ত, বড় বেজার। এতগুলি সাধের ঘোড়া গেলে কে না বেজার হয়? তিনি তখনি ঘোড়ার ডাক্তার ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাদের ব্যবস্থা হইল, বানরের চর্ব্বি ঘায়ে দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইবে, ঘা-ও ক্রমে শুকাইয়া যাইবে।

রাজার অনেক বানর। হুকুম হইল বানর মারিয়া চর্ব্বি লও। সেই আজ্ঞায় বানরগুলিতো সব মারা গেল। এ সংবাদ শুনিল বানরপালের গোদা। বংশ গেল শুনিয়া সে তো বড় কাতর, বড় অস্থির। সে শোকে আহার বিহার ছাড়িল। সে বনে বনে ঘুরিতে লাগিল। সে কেবল কাঁদে। এখন তাহার প্রাণে প্রবল জ্বালা হইল। সে প্রতিহিংসার চিন্তায় মগ্ন হইল। প্রতিজ্ঞা করিল চন্দ্র রাজার বংশ সে শেষ করিবে। প্রতিহিংসার আগুন বড় প্রবল; সহজে কি তা' নিবিয়া যায়?

বৃদ্ধ বানরের একদিন বড়ই পিপাসা হইল। সে আর কোথাও জল পায় না। সারা বন ঘুরিয়া সে এক জায়গায় একটি সুন্দর পুকুর দেখিল। লোকে পুকুরটাকে ডাকে 'পদ্ম দীঘি'। বানর তার পাড়ে গেল, দেখিল কতকগুলি পদ্মের মৃণাল পড়িয়া আছে। পুকুরটা আবার বনের এক কোণে,—সেখানে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত নাই। বৃদ্ধ বানর মনে মনে ভাবিল,—

"আমার বোধ হয় এই পুকুরে কোন রাক্ষস আছে। নামিয়া জল খাইলে এখনই সে আমায় ধরিবে। তবে কি আর রক্ষা

আছে ? বাবা, এখনই যে ধরিয়া খাইবে। আমি জলে নামিব না। একগাছা মৃণালে জল পান করিয়া পিপাসা দূর করি।”

বৃদ্ধ বানর তীরের এক গাছা মৃণাল লইয়া জলপান করিতে লাগিল। আর কি দেরী হয় ? তখনই এক ভয়ানক রাক্ষস জল হইতে উঠিয়া আসিল। তাহার গলায় রত্নের মালা। সে একবারে বৃদ্ধ বানরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। রাক্ষস হাসিতে হাসিতে বানরকে কহিল,—

“ওহে বানর! আমি এই সরোবরে বাস করি। যে নামিয়া জলপান করে, আমি তাহাকেই খাইয়া ফেলি। তুই কিন্তু বড় ধূর্ত্ত। তোর এইরূপ বুদ্ধি দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এই পর্য্যন্ত এইরূপ বুদ্ধি দেখাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। যদি তোর মনে কিছু বাসনা থাকে, আমার নিকট প্রার্থনা কর্, আমি তাই পূর্ণ করিয়া দিব।”

বুড়ো বানর জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কেমন খাইতে পারেন, আগে বলুন্ তো ?”

রাক্ষস উত্তর করিল, “সে কথা আর কি বলিব ? কোটি কোটি জন্তু জলে নামিলেও আমি অনায়াসে খাইতে পারি। কিন্তু যদি আমি এই সরোবর হইতে বাহির হই, তবে আর আমার কোন শক্তি থাকে না। একটা সামান্য শেয়ালেও তবে আমাকে প্রাণে মারিতে পারে।”

বানর কহিল, “চন্দ্র রাজার সহিত আমার বড় শত্রুতা। যদি

আপনি এই রত্নমালা আমাকে দেন, আমি লোভ দেখাইয়া সেই রাজাকে পরিবার সহিত এই সরোবরে আনিয়া দিতে পারি। আপনারও বেশ খাওয়া হইবে, আমারও শত্রুনাশ হইবে। তার পরিবারে কিন্তু অনেক লোক,—তা'দিগকে পাইলে আপনার কিন্তু খুব পেট ভরিবে।"

রাক্ষস সম্মত হইল। বিশ্বাস করিয়া রাক্ষস তখনই সেই রত্নমালা বানরের গলায় দিল। সেই রত্নমালা গলায় পরিয়া বানর নগরে চলিয়া গেল। লোকে যেন তাহাকে দেখিতে পায়, এই জন্য সে এ বাড়ী ও বাড়ী, এ গাছ ওগাছ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরের বহু লোক তাহাকে দেখিতে পাইল। অনেকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"ওহে বুড়ো বানর! এত দিন কোথায় গিয়াছিলে? তোমার গলায় কি? এমন সুন্দর রত্নমালা তুমি কোথায় পাইলে?"

বানর উত্তর করিল, "পাইয়াছি কোথায়, সে কথা কি আর বলা ভাল? শুনিতে চাও তো শোন। এক বনে কুবেরের এক লুকানো দীঘি আছে। সেখানে রবিবারে অতি ভোরে স্নান করিলে কুবের প্রসন্ন হন। যারা যারা স্নান করে, কুবের তাদের সকলকেই এমন এক এক ছড়া রত্নমালা দিয়া থাকেন।"

বানরের এই কথা চাপা রহিল না। এমন কথা চাপা থাকেও না! কথাটা লোকমুখে রাজার কাণে গেল। তিনি তখনই বানরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ওহে কপিরাজ! শুনিলাম তুমি নাকি এক সরোবর দেখিয়াছ, তাহাতে স্নান করিলে রত্নমালা পাওয়া যায় ?"

বানর উত্তরে কহিল, "মহারাজ! সত্য কি মিথ্যা আমি কি করিয়া বলিব ? প্রত্যক্ষেই তো দেখিতে পারেন। এই আমার গলাতে সেই রত্নমালা রহিয়াছে। যদি এমন রত্নমালার প্রয়োজন থাকে, একজনকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিন, আমি তাহাকে এখনই এই ঘটনা দেখাইয়া আনি।"

রাজা শুনিয়া কহিলেন, "তোমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। অন্যের যাওয়ার দরকার নাই, আমিই পরিবার লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব। যদি কথাটা ঠিক হয়, একবারেই অনেক-গুলি রত্নমালা পাইতে পারিব তো ?"

বানর কহিল, "হাঁ, মহারাজ! এ কথাই বেশ। আপনি পরিবার লইয়া নিজে গেলেই সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবেন।"

বানর বড় খুসী। এবার প্রতিহিংসা লইতে পারিবে,—বানর খুসী হইবে না কেন ? সে রাজাকে রত্নমালার জন্য কত লোভ দেখাইতে লাগিল।

রাজা রত্নমালার লোভে পরিবার লইয়া সেই সরোবর দেখিতে চলিলেন। রাজার ভয়—পাছে বানর পলাইয়া যায়। তিনি নিজে বানরকে কোলে করিয়া চলিলেন। বানরের বড় সুখ, রাজার কোলে বসিয়া যাইতে লাগিল। লোভের কি মহিমা! সে টান কি যে-সে ছাড়াইতে পারে ? পৃথিবীর সমস্ত

ধন-দৌলত লাভ হউক, তবুও লোকের লোভ দূর হয় না, আকাঙ্ক্ষা বা আশার নিবৃত্তি হয় না!

রাজা পরিবার লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে তাঁহারা সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিলেন, সত্যই তো এক আশ্চর্য্য সরোবর। কত পদ্ম, কত কুমুদ, কত কহ্লার তাহাতে ফুটিয়া আছে!

ক্রমে রাত ভোর হইল। তখন বানর রাজাকে কহিল,

"মহারাজ! স্নানের এইতো সময়। আর বিলম্ব করিবেন না। অতি ভোরে এই সরোবরে স্নান করিতে হয়। আগে পরিবারের সকলে এক সঙ্গে স্নান করিয়া আসুন, পরে মহারাজ আমার সঙ্গে স্নান করিতে যাইবেন। উহারা স্নান করিতে গেলে আমি আপনাকে এই সরোবরে কত রত্নমালা আছে, দেখাইতে পারিব।"

রাজা বানরের কথায় বিশ্বাস করিলেন। তিনি তখনই পরিবারের লোকদিগকে আগে স্নান করিতে হুকুম করিলেন। বড় লোভ—স্নান করিলেই যে রত্নমালা লাভ হইবে!

সমস্ত পরিবার—ছেলেপিলে, যোয়ান বুড়ো, স্ত্রীপুরুষ নামিয়া ডুব দিলেন। রাক্ষস তখনই তাঁহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। রাজার মনে বড় আনন্দ—তিনি হাজার হাজার ছড়া রত্নমালা পাইবেন। অনেকক্ষণ যায়, কেহই আর জল হইতে উঠেন না। বানরের মনে বড় আনন্দ,—তার প্রতিহিংসা লওয়া হইল। বিলম্ব দেখিয়া রাজা বানরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নান করিয়া

উঠিতে এদের এত বিলম্ব হইতেছে কেন ? সকলে একসঙ্গে ডুব দিল, কেউ যে আর উঠে না। আমার যে বড় ভাবনা হইতেছে।”

বানর রাজার কথা শুনিয়াই এক গাছে চড়িয়া বসিল। সে তখন শোক করিতে করিতে কহিল, “ওরে দুষ্ট, এই জল-মধ্যে এক রাক্ষস বাস করে। সে তোমার সমস্ত পরিবার খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা আর উঠিবে না। তুমি পূর্ব্বে আমার বংশ শেষ করিয়াছ, আমি এত দিনের পর তাহার প্রতিশোধ লইলাম। এখন আর আমার কোন শোক নাই। তোমার আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই। তুমি ছিলে রাজা, তোমার অনেক নুন খাইয়াছি, তাই তোমাকে এই সরোবরে নামিতে দেই নাই। ইহাতে আমার দোষ নাই। তুমিই প্রথমে আমার উপরে হিংসা করিয়াছিলে। আমি এখন তাহার প্রতিহিংসা লইলাম। এই কাজে আমাকে দোষী বলিবে কি ?”

রাজা বানরের কথা শুনিয়া বজ্রাহত,—মুখে তার রা নাই, শোকে দুঃখে তিনি পাগলের মত। রাজা আর সে রাজা রইলেন না। বংশ লোপ হইল বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে যে পথে আসিয়াছিলেন, তিনি সেই পথেই কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। লোভের প্রতিফল রাজার হাতে হাতে ফলিল !

রাজা চলিয়া গেলেন। রাক্ষস জল হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “ওহে বন্ধু ! তোমার বুদ্ধি কি চমৎকার ! বুদ্ধির কৌশলে তুমি আজ আমাকে পরিতৃপ্ত করিলে। বুদ্ধি

আছে বলিয়া তোমার সব কাজ সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি এই দীঘির জলেও নাব নাই, নিজের কাজ হাসিল করিতে যাইয়া তোমার রত্নমালাও হারাও নাই। বাস্তবিক তোমাকে ধন্যবাদ। আজ শত্রু নাশ এবং মিত্রলাভ দুই-ই হইল।"

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্পটি শেষ করিয়া বন্ধু কহিলেন, "চঞ্চল হইয়া কোন কাজ করিতে নাই। যে ভবিষ্যৎ না ভাবে—যে ভবিষ্যৎ আপদের দিকে চোখ্ না রাখে, সে চন্দ্র-রাজার ন্যায় বিড়ম্বনাই লাভ করে।" বন্ধু আবার কহিলেন, "এখন, ভাই, অনুমতি কর, আমি ঘরে ফিরিয়া যাই।"

চক্রধর কহিলেন, ভাই, "লোকে আপদ দূর করিতেই ধন সংগ্রহ করে, মিত্রের আকাঙ্ক্ষা করে। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তুমি আমাকে এ অবস্থায় রাখিয়া কোন্ প্রাণে ঘরে ফিরিয়া যাইবে, ভাই ?"

বন্ধু উত্তর করিলেন, "ভাই ! কথাটি ঠিক বটে। কিন্তু এ স্থান যে মানুষের অগম্য। বিশেষ তোমাকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা তো আর কারো নাই। চক্রে কি বিষম বেদনা পাইতেছ, তোমার মুখের চেহারায়ই বেশ বুঝা যাইতেছে। আমার বিশ্বাস, তাড়াতাড়ি না গেলে, আমারই বা এরূপ কোন বিপদ ঘটে। সত্যই তোমার ভ্রূকুটি দেখিয়া আমার পলাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

এটা অন্যায়ও নয়। এক রাক্ষস কিন্তু এক বানর-বন্ধুর ভ্রূকুটি দেখিয়া পলাইয়া ছিল। রাক্ষস মনে করিয়াছিল, "বানরকে কালে ধরিয়াছে,—আমাকে বা আবার কালে ধরে।"

বন্ধু গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

শাখা গল্প ১০—

রাক্ষস ও বানরের উপাখ্যান।

কোন নগরে এক রাজা ছিলেন, নাম ভদ্রসেন। তাঁহার ছিল একটী মেয়ে,—বড় সুন্দরী, তার নাম রত্নবতী। মেয়ের রূপের কথা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কোন ঘটনায় এক রাক্ষস তাহাকে দেখিতে পায়। রাক্ষস তো সেই রূপে একেবারে পাগল। সে রত্নবতীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। রাজকুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি সোজা? তিনি যে সর্ব্বদা সাবধানে থাকেন, কত দাসদাসী যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। রাজবাড়ীতে পাহারার অন্ত নাই। রাক্ষস খুব চেষ্টা করিল কিন্তু কোন মতেই তাঁহাকে চুরি করিতে পারিল-না। সেই রাক্ষস প্রকাশ্যে তো রাজপুরীতে ঢুকিতে পারিত না,—সে কিন্তু আঁটিল এক ফন্দি। সে রোজই মায়ারূপ ধরিয়া রাজকুমারীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত, কেউ টের পাইত না। কিন্তু যখন বেশী লোকজন দেখিত, অমনি তাড়াতাড়ি আবার ফিরিয়া আসিত।

এক দিন রাক্ষস আগের মত বিকাল বেলা রাজপুরীতে গেল। কেহ যেন না দেখে এমন ভাবে সে এক আড়ালে লুকাইয়া রহিল। সে সাবধানে সব দেখে, সব শোনে। সে শুনিতে পাইল রত্নবতী সখীদিগকে কি কহিতেছেন। সে মনোযোগ করিয়া রত্নবতীর কথা শুনিল,—

"আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। প্রতিদিন বিকাল বেলা একটা রাক্ষস আসিয়া উৎপাত করে। দুরাত্মাকে নিষেধ করিবার কোন উপায় তোমরা করিতে পার কি?"

রাক্ষস শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,

"হয় ত 'বিকাল' নামে আর কোন রাক্ষস রাজপুরীতে চুরি করিতে আসে, কিন্তু চুরি করিতে পারে না। আমি মায়ায় এক ঘোড়ার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিতো সে দুরাত্মা কেমন?"

রাক্ষস সত্যই একটা ঘোড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। রাত্রি হইল। যখন দুপুর রাত, তখন এক চোর ঘোড়া চুরি করিতে রাজার আস্তাবলে ঢুকিল। সে এক এক করিয়া সকল ঘোড়াই বেশ করিয়া পরীক্ষা করিল। রাক্ষস যে ঘোড়ায় ঢুকিয়াছিল, সে সেই ঘোড়াটাকেই পসন্দ করিল। চোর সেই ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাইয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল।

রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করিল, "এই সেই বিকাল নামা রাক্ষস। বেটা ঠিক বুঝিতে পারিয়া আমাকে বধ করিতেই আসিয়াছে। আমার উপর তার যে রাগ, এখন উপায় কি?"

রাক্ষসতো আকুল। এমন সময় চোর ঘোড়াটাকে চাবুক লাগাইয়া ছুটাইয়া চলিল। রাক্ষস আর করে কি? সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পৈ পৈ ছুটিল। চোর কত জোরে লাগাম টানে, তাহাকে কি সে স্থির রাখিতে পারে? ঘোড়া তো লম্বাদৌড়! সেতো আসল ঘোড়া নয় যে লাগামের টান মানিবে? চোর যতই লাগাম টানে, ঘোড়াও তত বেগে ছোটে।

চোর তখন চিন্তা করিল, "এটা তো সত্য ঘোড়া কখনই নয়! ঘোড়ার গতি কখনও এমন বেশী হয় না। এ অবশ্যই কোন রাক্ষস, ঘোড়ার রূপ ধরিয়াছে। এখন যদি কোন উচু স্থান ধরিতে পারি তবেই তো রক্ষা, নচেৎ আমাকে মরিতে হইবে।"

চোর প্রমাদ গণিল। সে ইষ্টদেবতার নাম জপিতে লাগিল। দৈবের ঘটনা, ঘোড়াটা এক বট গাছের নীচ দিয়া দৌড়িল। চোর তখনই তাহার জটা ধরিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িল। চোর ভাবিল, 'এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাইলাম।' ঘোড়াও ভাবিল, "প্রাণে বাঁচিলাম, বাবা।"

সেই বট গাছে বাস করিত এক বানর। সে ছিল রাক্ষসটার বন্ধু। সে কহিতে লাগিল, "তোমার তো ভারি ভয় দেখিতেছি! তোমার বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই যে নাই! মানুষ তোমার খাওয়ার জিনিষ। এস, এস শীঘ্র ফিরিয়া এস। একে এখনই খাইয়া ফেল। তোমার আপদ চুকিয়া যাক্।"

রাক্ষস বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করিল। তখন তাহার সাহস

আসিল। সে তখনি নিজমূর্ত্তি ধরিল। ভয় কি তার অত সহজে যায়? সে 'কি হয়, কি হয়' ভাবিয়া আকুল হইল। চোর দেখিল প্রমাদ। সে বানরের দুষ্টুমি দেখিয়া রাগে অগ্নিশর্ম্মা। আর হঠাৎ বা তার করিবে কি? সে বানরের লম্বা লেজ মুখে ধরিয়া চিবাইতে লাগিল। বানরের কি চীৎকার, কি হা-হুতাশ! তবু কি চোর লেজ-চিবান ছাড়ে?

বানর বুঝিল চোরই বলবান, রাক্ষসের পরাক্রম কিছুই নাই। বানর ব্যথায় বড়ই কাতর হইল। চোর কিন্তু লেজ চিবান ছাড়ে নাই। বানর দাঁতে দাঁত রাখিয়া, চক্ষু বুজিয়া, মুখ সিট্‌কাইতে লাগিল। রাক্ষস ভয়ে নিকটেও আসিল না। দূর হইতে তাহার ভ্রূকুটি দেখিয়া কহিল,

"বন্ধু! তোমার মুখের যেমন ভ্রূকুটি, বোধ হয় তোমাকে বিকালে ধরিয়াছে। আমার এখন পলাইয়া যাওয়াই ভাল, কি জানি যদি বা বিকাল আমায় ধরে!" মুখের ভঙ্গি দেখিলেই লোকের ব্যথা কষ্ট বোঝা যায়। রাক্ষস আর কি সেখানে থাকে, সে তো দৌড়িয়া দূরে পলাইল!

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্পটিতো শেষ হইল। বন্ধু কহিলেন, "ভাই! আর আমাকে এখানে থাকিতে অনুরোধ করিও না। আমি এখন ঘরে যাই। তুমি কিছুকাল এখানে থাক। বন্ধুর কথা যে

শোন নাই, তারই ফল ভোগ কর। আমি আর এখানে থাকিয়া কি করিব? অদৃষ্টের কষ্ট, ভুগিতেই হইবে যে, ভাই।"

চক্রধর কহিলেন, "ভাই! আমায় দোষ দাও বৃথা। দৈবেই এ সকল দুর্ঘটনা ঘটায়। মানুষের ভাল মন্দ কেবল দৈবের উপর নির্ভর করে। যখন অশুভ ঘটিবার হয়, কোন মতেই তাহা খণ্ডে না। আবার যখন দৈব অনুকূল হয়, বিপদও তখন সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়। এ বিষয়ে এক গল্প আছে। গল্পটি বেশ, সে এক অন্ধ, এক কুঁজো আর এক রাজকুমারীর উপাখ্যান। গল্পটি শোন—

শাখাগল্প ১১—

এক অন্ধ, এক কুঁজো আর এক অধিকাঙ্গী রাজকন্যার উপাখ্যান।

"উত্তরাপথে মধুপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে মধুসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বড় বিচক্ষণ। দৈবের ঘটনা, রাজার একটি কন্যা জন্মে—তাঁর একটি আঙ্গুল বেশী। কুলক্ষণা কন্যা হইয়াছে শুনিয়া তো রাজা বড়ই দুঃখিত, বড়ই উদ্বিগ্ন। তিনি তখনই মন্ত্রীকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন—

"দেখ মন্ত্রী, তুমি এই মেয়েটাকে এখনই এক বনে ফেলিয়া এস, কেউ যেন টের না পায়। এই দেখ, মেয়েটার একটা

আঙ্গুল বেশী। সন্তানের শরীরের কোন কিছু অধিক হইলে বড় কুলক্ষণ—বাপ মারা যায়।”

মন্ত্রী রাজার হুকুম শুনিয়া তো অবাক। তিনি হাত যোড় করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! অধিকাঙ্গী কন্যা সত্যই কুলক্ষণা। শাস্ত্রেও তাকে অপরাধিনী স্থির করিয়াছে সত্য। কিন্তু একবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডাকিয়া মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয় না? ইহকাল পরকাল তো আছে মহারাজ? শাস্ত্রকারেরা বলেন, “জ্ঞান বুদ্ধি থাকিলেও সর্ব্বদা পরামর্শ লইতে হয়।” পুরাকালে এক ব্রাহ্মণকে রাক্ষসে পায়। তিনি কেবল মতলব আঁটিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পান।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ আবার কি কথা?” মন্ত্রী গল্পটী কহিতে আরম্ভ করিলেন—

শাখাগল্প ১২—

পরামর্শ জিজ্ঞাসার ফলের উপাখ্যান।

“এক বনে চণ্ডকর্ম্মা নামে এক রাক্ষস বাস করিত। এক দিন সে বেড়াইতে বেড়াইতে এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল। সে তখনই তাঁহার কাঁধে চড়িয়া কহিল, “চল্‌রে বামন, চল্‌।”

ব্রাহ্মণ তো ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাক্ষসটাকে কাঁধে লইয়া চলিলেন। কিছু দূর গেলে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, রাক্ষসের দুখানি

পা-ই বড় সুন্দর, বড় নরম। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই রাক্ষস, কিরূপে তোমার পা দুখানি এমন নরম হইল ?"

রাক্ষস উত্তর করিল, "আমি কখনও মাটীতে পা ফেলিয়া চলি নাই। মাটি ছুঁইয়া চলিব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

ব্রাহ্মণের বড় ভাবনা হইল, তিনি আপনার পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই তাহারা দুইজনে এক দীঘির নিকটে গেলেন। রাক্ষস দীঘি দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিল,

"আমাকে এখানে নামাইয়া দে, আমি এই দীঘিতে স্নান পূজা শেষ করি। যতক্ষণ আমার আসিতে বিলম্ব হয়, ততক্ষণ তুই এখানে বিশ্রাম কর্, দেখিস্ কোথাও পলাইয়া যাস্‌নে যেন।"

এই কথা বলিয়া রাক্ষস স্নান পূজা করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ সেখানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাক্ষস তো স্নান পূজা করিতে গেল। ইহার পরে আসিয়াই তো সে আমায় খাইয়া ফেলিবে। আমার আর এখানে দেরী করা ঠিক নয়, পলাইয়া যাওয়াই উচিত। এই রাক্ষস কখনও মাটি ছোঁয় না। আমি যদি পলাই, সে আমার পিছু পিছুও ছুটিতে পারিবে না।"

এই রকমের অনেক চিন্তা হইল। শেষে ব্রাহ্মণ পলাইয়া গেলেন। রাক্ষস ফিরিয়া আসিয়া অবাক্। সে আর ব্রত ভঙ্গের ভয়ে ব্রাহ্মণের পিছু পিছু খোঁজে যাইতে পারিল না। ব্রাহ্মণ রক্ষা পাইলেন।

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

মন্ত্রী গল্পটি শেষ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এইজন্যই আমি কহিলাম, নিজে অভিজ্ঞ কি জ্ঞানী হইলেও সর্ব্বদা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে আসিলেন। রাজা অধিকাঙ্গী কন্যাকে পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, এই বিষয়ের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের দাস, তাঁরা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি 'কন্যা হীনাঙ্গী ও অধিকাঙ্গী হয়, তবে বিধবা হয়। স্বভাবও তার খুব ভাল হয় না। আরো কথা, কন্যা অধিকাঙ্গী হইলে শীঘ্রই বাপ মরিয়া যায়। অতএব মহারাজ! যাহাতে তাহাকে আর দেখিতে না হয়, তার একটা উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ উহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ কন্যা সমর্পণ করুন, আর তাহাকে এদেশ ছাড়িয়া যাইতে আজ্ঞা করুন। এইরূপ করিলে আপনাকে আর দোষী হইতে হইবে না, ইহলোকে ও পরলোকে পাপভাগী হইতে হইবে না।"

রাজা পণ্ডিতদের ব্যবস্থাই শুনিলেন। তিনি সকল জায়গায় ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'এই অধিকাঙ্গী রাজকন্যাকে যে বিবাহ করিবে, রাজা তাহাকে একলক্ষ মোহর দিবেন, কিন্তু তাহাকে এই ক'নে লইয়া অন্য দেশে যাইয়া বাস করিতে হইবে।'

ঘোষণার পর কিছু কাল অতীত হইল, কিন্তু কোন লোকই রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিল না। রাজকুমারী ক্রমে যুবতী হইয়া উঠিলেন।

ঐ নগরে এক অন্ধ বাস করিত। মন্থর নামে এক কুজোঁ তাহার সহচর ছিল। কোথাও যাইতে আসিতে হইলে সেই কুজোঁই অন্ধকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইত। তাহারা দুইজন ঘোষণার ঢেঁড়া শুনিয়া মন্ত্রণা করিল—

"চল ভাই! এই ঘোষণার ঢেঁড়া ধরা যাক্। যদি বিবাহ করিলে রাজকন্যা আর অর্থ পাই, তবে তো আমাদের পরম সুখ! সেই টাকায় আমরা অনায়াসে সুখে থাকিতে পারিব। আর যদি মেয়েটার দোষে একান্তই মৃত্যু ঘটে, তা'ও তো ভাল। তাহা হইলেও এই যে অসহ্য কষ্ট, তা হইতে রক্ষা পাইব।"

মন্ত্রণা স্থির হইল। অন্ধ ঘোষণার ঢেঁড়া ধরিয়া কহিল, "ওহে ঢ্যাঁড়াদার! আমি তোমাদের রাজকন্যাকে বিবাহ করিব, তুমি যাইয়া রাজাকে খবর দাও।"

ঢ্যাড়াদার রাজার নিকট যাইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! এক অন্ধ এই ঢেঁড়া ধরিয়াছে। এখন মহারাজের যে হুকুম।"

রাজা কহিলেন, "অন্ধ, গরিব, কুষ্ঠী, চাঁড়াল যে কেহ আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে পারিবে। কিছুতেই আমার আপত্তি নাই। যে বিবাহ করিবে, আমি তাকেই একলাখ মোহর দিব।"

রাজার আদেশ, রাজপুরুষেরা তখনই অন্ধকে এক নদীর তীরে লইয়া গেল। সেখানে তাহারা অধিকাঙ্গী রাজকুমারীকে

সেই অন্ধের সঙ্গে বিবাহ দিল। অন্ধ একলাখ মোহর পাইল। রাজপুরুষেরা বর কন্যাকে এক নৌকায় উঠাইয়া দিয়া মাঝিদের আদেশ করিল, "তোরা এই কুঁজোর সহিত এই বর ক'নেকে আর কোন রাজার রাজ্যে রাখিয়া আয়।"

মাঝিরা তাহাই করিল। সেই তিন জন বিদেশে এক বাড়ী খরিদ করিয়া বড় সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

এই গল্প শেষ করিয়া চক্রধর সুবর্ণসঙ্ককে কহিলেন, "আমি তাই কহিতেছিলাম, বিধাতা অনুকূল হইলে বিপদও সম্পদ হইয়া উঠে।"

সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন, "ভাই! তোমার একথা মিথ্যা বলিতে পারি না। দৈব অনুকূল হইলে যেখানে সেখানে জয় হয়, তবু কিন্তু ডাকনীতির কথা অহঙ্কারে ঠেলিয়া ফেলা ঠিক নয়। যিনি গোঁয়ার, সাধু লোককে ঘৃণা করেন, তাঁহার অবস্থা তোমার মতই হইয়া থাকে। ভাই! ঐক্যের অপার গুণ। একতাবিহীন হইলে ভারণ্ড পক্ষীর মত কষ্ট পাইতে হয়।"

চক্রধর কহিলেন, "ভাই! সে গল্প কেমন, বল দেখি শুনি।"

সুবর্ণসিদ্ধ গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

শাখা গল্প ১৩—

ভারণ্ড-পক্ষীর দুর্দ্দশার উপাখ্যান।

"এক সমুদ্রের উপকূলে ভারণ্ড নামে এক পক্ষী বাস

করিত। তাহার ছিল এক উদর আর দুই মুখ। একদিন সে সমুদ্রের তীরে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একটি অমৃত ফল ঢেউয়ে ভাসিয়া আসিতেছে। ভারণ্ড দেখিয়াই তাহা তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। খাইতে খাইতে ভারণ্ড কহিল,—

"আমি অনেকবার এই রকমে ঢেউয়ে ভাসা ফল খাইয়াছি, কিন্তু ইহার আস্বাদ যে বড় মধুর। এমন অপূর্ব্ব ফল আর কখনও ত খাই নাই! আমার বোধ হয় এ কোন দেবাংশী গাছের বা কোন অমৃত গাছের ফল হইবে, কোনরূপে ছিড়িয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার এমনই গুণ যে জিহ্বায় লাগিলেই মহাতৃপ্তি জন্মে।"

ভারণ্ড একমুখে এই সকল কথা কহিতেছে, এমন সময়ে দ্বিতীয় মুখ কহিল, "যদি এরূপ ফল পাইয়া থাক, তবে আমাকে উহার একটু দাও না, আমিও খাইয়া জিভের আশ মিটাই।"

প্রথম মুখ কহিল,"আমরা দুইয়েই এক উদরের জন্য আহার করি। তাতে এক উদরেরই তৃপ্তি জন্মে। তবে দুই মুখের খাওয়ায় প্রয়োজন কি? বরং নিজের অংশ খাইয়া অবশিষ্টটা প্রিয়তমা ভারণ্ডীকে দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।"

এই কথা বলিয়া ভারণ্ড সেই বাকী অংশটুকু ভারণ্ডীকে দিল। ভারণ্ডী তাহা খাইয়া বড়ই তৃপ্ত হইল।

দ্বিতীয় মুখ নিরাশ হইল। সেইদিন অবধি সে অতি দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিল। একদিন সে তো একটি বিষফল দেখিতে পাইল। তখনই তাহা লইয়া সে প্রথম মুখকে কহিল,—

"ওরে নির্দ্দয়! এই দেখ্ আমি বিষফল পাইয়াছি। এখনই আমি ইহা খাইয়া ফেলিব।"

প্রথম মুখ কহিল, "ওরে মূর্খ! এমন কাজও করিস্ না। এই ফল খাইলে আমাদের দুইয়েরই মৃত্যু নিশ্চয়। আমার অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা কর্। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখনও তোর সঙ্গে অমন কাজ করিব না।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই 'দ্বিতীয় মুখ' সেই বিষফল খাইয়া ফেলিল। বিষফল যাই পেটে পড়িল, অমনি দুই মুখই নিস্তব্ধ হইল। ভারণ্ড মারা পড়িল।

* * * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

এই গল্প শেষ করিয়া সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন,'তাই আমি বলিতে-ছিলাম যে অনৈক্যের অনেক দোষ, একতার অনেক গুণ।'

চক্রধর কহিলেন, "ভাই! তোমার সকল কথাই সত্য। এক্ষণে তুমি বাড়ী চলিয়া যাও। কিন্তু একটি কথা বলি, কখনও একলা যাইও না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, 'একাকী পথ চলিতে নাই। পথে একজন যেমন-তেমন লোক সঙ্গে থাকিলেও খুব উপকার।' আমি প্রত্যক্ষে দেখিয়াছি, এক পথিক এক কাঁকড়ার সাহায্যে সাপের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।"

সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন, 'সে কেমন কথা?' চক্রধর গল্পটি কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

শাখাগল্প ১৪—

ব্রহ্মদত্ত ও কাঁকড়ার উপাখ্যান।

"এক গ্রামে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদিন তিনি কোন প্রয়োজনে অন্য এক গ্রামে যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার মা কহিলেন,—'বাছা! একলা এতদূর যাইও না, আর কেউকে সঙ্গী লইবার চেষ্টা কর। একজন লোক সঙ্গে থাকিলে পথের সহায় হইতে পারিবে।'

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, "মা, ভয় কি? এ সকল পথে কোন ভয় নাই। আজ আমার বিশেষ আবশ্যক আছে, আমার না গেলেই নয়। সঙ্গী খুঁজিয়া আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। এখন আমাকে একাকীই যাইতে হইবে।"

পুত্রের যাওয়ার বড় আগ্রহ, মা সঙ্গীর মত দিতে পারেন এমন কিছুই পাইলেন না। নিকটে ছিল একটা কূপ। তিনি একটা কাঁকড়া ধরিয়া আনিয়া কহিলেন, "বাছা! যদি তোমার একান্তই যাইতে হয়, তবে এই কাঁকড়াটিকে সঙ্গে লইয়া যাও, এ তোমার পথের সহায় হইবে।"

ব্রহ্মদত্ত বড় মাতৃভক্ত। তিনি মার কথা অবহেলা করিলেন না। মা ছেলের জন্য ক্ষার চিনি প্রভৃতি খাবারের একটি পুঁটলী দিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত মার হাত হইতে সেই কাঁকড়াটা লইয়া পুঁটলীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মদত্ত যাত্রা করিলেন।

চলিতে চলিতে বেলা দুপুর হইল। ব্রহ্মদত্ত রৌদ্রে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পথে একটি গাছ দেখিয়া তাহার নীচে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। বিশ্রাম করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সেই গাছের তলে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

গাছে একটা কালো সাপ ছিল। সে ব্রাহ্মণকে ঘুমাইতে দেখিয়া সেই গাছ হইতে নীচে নামিল। সে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের নিকটে আসিল। খাবারের পুঁটলীটি ব্রাহ্মণের নিকটেই ছিল। সাপটা খাবারের গন্ধ পাইয়া বড়ই লোভী হইল। সে প্রথমে খাবার খাইতে আরম্ভ করিল।

পুঁটলী কাটিয়া খাবার খাইতে খাইতে কালো সাপটা কাঁকড়া-টাকেও গিলিয়া ফেলিল। কাঁকড়া বড় সোজা জীব নয়, সে কালো সাপের গলা কাটিয়া বাহির হইল। গলা কাটা গিয়াছে, সাপটা কি আর বাঁচে ? সে মরিয়া গেল।

একটু পরেই ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম হইতে উঠিয়াই তিনি দেখিলেন, পার্শ্বেই একটা বড় কালসাপ মরিয়া রহিয়াছে! তখনও তাহার গলা হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। ব্রাহ্মণ তো অবাক! তাঁহার পুঁটলী ছেঁড়া, তাহাতে কিছুই খাবার নাই, কাঁকড়াটি একটু দূরে হাঁটিতেছে।

শীঘ্রই কিন্তু ব্রহ্মদত্তের ভয় ও বিস্ময় দূর হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,

"আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে এই কাল সাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। বোধ হয়, এই কাঁকড়াই সাপটার গলা

কাটিয়া বাহির হইয়াছে। ভাগিস্ আমি মার কথা মানিয়া কাঁকড়াটিকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম! মা মহাগুরু। আমি যদি মার কথা অশ্রদ্ধা করিয়া আসিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণও যাইতে পারিত।"

এই চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মদত্ত আপনার স্থানে চলিয়া গেলেন। সঙ্গীর গুণে তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেন।

* * *

পূর্ব্ব গল্পারম্ভ।

গল্প শেষ করিয়া চক্রধর সুবর্ণসিদ্ধকে কহিলেন, "তাই বলিতেছিলাম, একলা পথ চলিতে নাই। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই উচিত।"

এই কথা শুনিয়া সুবর্ণসিদ্ধ চক্রধরের অনুমতি লইয়া নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। চক্রধর বিষম যাতনা ভুগিতে রহিলেন।